ঊর্মিমুখর

(মে ১৯৩৫—সেপ্টেম্বর ১৯৩৬)

অনেকদিন এবার গ্রামে আসি নি। প্রায় মাস-তিনেক হল। এবার দেশে গরমও খুব। একটুকু বৃষ্টি নেই কোনদিকে। দুপুরের দিকে হাওয়া যেন আগুনের হল্‌কর মত লাগে।

এবার গ্রামে এসে আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখি সল্‌তেখাগী আমগাছটা ঝড়ে ভেঙে গিয়েচে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। সল্‌তেখাগী ঝড়ে ভেঙে গেল! ও যে আমার জীবনের সঙ্গে বড় জড়ানো নানাদিক থেকে। ওরই তলায় সেই ময়নাকাঁটার ঝোপটা, যার সঙ্গে আবাল্য কত মধুর সম্বন্ধ।

সল্‌তেখাগীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে জ্বালানী করবে এবার হাজারী কাকা। সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপনার নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ অনুভব করলুম।

গাছপালাকে সবাই চেনে না। এতদিনের সল্‌তেখাগী যে ভেঙে গেল, তা নিয়ে আমাদের পাড়ার লোকের মুখে কোনো দুঃখ করতে শুনি নি।

পথের পাঁচালীতে সল্‌তেখাগীর কথা লিখেচি। লোকে হয়তো মনে রাখবে ওকে কিছুদিন।

খুকুদের কাল আসবার কথা গিয়েচে দু-ধার থেকে। আজও এল না, বোধ হয় আবার জ্বর হয়ে থাকবে।

আজ বিকেলে বেলেডাঙার পথে বেড়াতে বার হয়েচি, পথে গিয়ে বসেচি গঙ্গাচরণের দোকানে, কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে গল্পসল্প করচি, এমন সময়ে কি মেঘ করে এল সুন্দরপুরের দিক থেকে! গঙ্গাচরণ বললে, খুব বৃষ্টি এল। আমি ওর দোকান থেকে বার হয়ে যেমন এসে বাঁওড়ের ধারের পথে পা দিয়েচি, অমনি বেলেডাঙার ওপারের বাঁশবনের মাথার ওপর কালবৈশাখীর মেঘের নীল নিবিড় রূপ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কোথা থেকে আবার এক সারি বক সেই সময় নীল মেঘের কোলে উড়ে চলেচে-সে কি অপরূপ রচনা! এদিকে মনে ভয় হচ্চে যে তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরতে হবে, ঝড় মাথায় মাঠের মধ্যে থাকা ভাল নয়, অথচ যাবো তার সাধ্যি কি! পা কি নাড়তে পারি? তারপর সোঁদালী ফুলের-ঝাড়-দোলা বনের ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলাম আমাদের ঘাটে। সেখানে স্নান করে যখন আমাদের গুয়াতেলির তলা দিয়ে যাচ্চি—হাজারী জেলেনী সেখানে আম কুড়ুচ্ছে—বড় চারার তলাতেও রথযাত্রার ভিড়। বৃষ্টি এল দেখে পালিয়ে বাড়ি এসে ঢুকলাম।

সল্‌তেখাগী আমগাছটা একেবারে কেটে ফেলে করাতীর দল তক্তা তৈরী করচে। হাজারী ঘোষ রোড্‌সেস নীলামে বাগান কিনেচে—ওই এখন তো কর্তা। ও কি জানে সল্‌তেখাগীর সঙ্গে আমার বাল্য-জীবনের কি সম্পর্ক!

কাল বিকেলে গোপালনগরে গিয়ে হাজারীর বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে ছিলুম। তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে ফর্দ ইত্যাদি করা হচ্চে, সকলে খুব ব্যস্ত। এমন সময়ে অনেকদিন আগেকার দেখা সেই ভদ্রলোকটি, হলদিবাড়িতে যাঁর পাটের ব্যবসা ছিল, তিনি এলেন। আজ প্রায় পনেরো বছর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি যখন কলেজে পড়তুম—ইনি তখন এই গ্রীষ্মের বন্ধের সময়ই মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। মতি দাঁয়ের দোকানের বাইরের বারান্দায় বসে এঁর সঙ্গে কত কি আলাপ হত। তখন এঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ, এখন পঁয়ষট্টি। কিন্তু তখন ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, ঘোর তার্কিক ছিলেন, অনেক ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতেন। এখন হয়ে পড়েচেন একেবারে অন্য রকম। আর কিছুতেই উৎসাহ নেই, নানারকম বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেচেন। একটা প্রধান বাতিক তার মধ্যে এই দেখ্‌লুম যে ওঁর বিশ্বাস, ওঁর শরীর খারাপহয়ে গিয়েচে, আর সারবে না। আমি কত বোঝালুম, বললুম, আপনার বয়েস হয়েচে, তার তুলনায় আপনার শরীর ঢের ভাল। কেন মিছে ভাব্‌চেন? ভদ্রলোকের ছেলে

আমার সঙ্গে গোপালনগর স্কুলে পড়তো অনেক দিন আগে। সে ছেলেটি শুনেচি মারা গিয়েচে। আমি সে কথা জিগ্যেস করিনি।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে খানিকদূর এলেন। আমি তাঁকে বোঝাতে বোঝাতে এলুম। তুঁত্তলায় স্কুলের কাছে তিনি চলে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়েচে, মাথার ওপর বৃশ্চিক উঠেচে, জ্বল জ্বল করছে নক্ষত্রগুলো—বাঁওড়ের মাথার ওপরে উঠেচে সপ্তর্ষি। এতক্ষণ বিয়ের বড়লোকী-ফর্দরূপ বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে থেকে মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল, এইবার এসেআকাশের দিকে মুক্ত বহুদূর নাক্ষত্রিক জগতের দিকে সেটা ছড়িয়ে দিয়ে বাঁচলুম।

হাট থেকে এসে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। বেলা খুব পড়ে গিয়েচে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের নির্মেঘ অপরাহ্ণের শোভা এত সুন্দর যে যার অভিজ্ঞতা নেই তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না। এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে বসে কত কথাই মনে আসে!

হাজার বছর কেটে যাবে—এই রঙীন মেঘমালা, এই গায়কপাখির দল, এই সব নরনারী, গাছপালা—কোথায় ভেসে যাবে কালস্রোতে, কিন্তু মানুষ তখনও থাকবে। নতুন ধরনের কি রকম মানুষ আসবে, কি রকম হবে তাদের সভ্যতা, কি জ্ঞানের আলো তারা পৃথিবীতে জ্বেলে দেবে—এই সব ভাবি।

নদীতে স্নান করতে নেমেচি, পুঁটি দিদি তখনও ঘাটে। বৃশ্চিক রাশির একটা নক্ষত্র খুব জ্বল্ জ্বল্ করচে। নদীর ওপারে সাঁই-বাবলা গাছগুলোতে অস্তদিগন্তের রঙিন্ মায়া-আলো পড়েচে।

সারারাত কাল আম কুড়িয়েচে লোকে লণ্ঠন ধরে। আমার মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে, মাঝে মাঝে দেখি সবাই আম কুড়ুচ্চে।

কাল করুণার সঙ্গে আকাইপুরে গেলুম যেমন প্রতি বৎসর যাই। করুণার মায়ের মুখে সেখানের গল্প শুনে বড় তৃপ্তি পাই। সহায়হরি ডাক্তারের দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা আবার শুনলুম। সে কত করুণ কাহিনী। তারপর শুনলুম মধু মুখুয্যে ও প্রেমাচাঁদ মুখুয্যের বাড়ির ডাকাতির গল্প। এ গল্প অবিশ্যি আমি ছেলেবেলায় শুনেচি, তবুও আবার ভাল করে শুনলুম। করুণাদের বাড়ির অতিথি-সেবা ও তার বাপের টাকা ওড়ার গল্প বড় মজার। টাকা আদায় করে নিয়ে আসছিল গোমস্তা। ২৫ টাকার হিসাব দিলে না। বললে, কর্তা মশায়, মাঠে ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, টাকাগুলো উড়ে গিয়েচে, আর পেলুম না। ওর বাবা তাকে রেহাই দিলেন। মরবার আগে সবাইকে ডেকে যত বন্ধকী খত সব ছিঁড়ে ফেললেন। ওঁর ছেলেরা কার নামে নালিশ করতে যাচ্ছিল, করুণার মা বললেন—শোন্, তা তো হবে না, কর্তা বারণ করে গিয়েচেন মরবার সময়ে। ওদের পীড়ন করতে পারবে না। যা দেয় নাও গে যাও।

একদিকে যেমন করুণার বাবা, অন্যদিকে তেমনি সহায়হরি ডাক্তার। সহায়হরির মত অর্থপিশাচ মানুষ পাড়াগাঁয়ে বেশী নেই। খতে টাকা উশুল দিলে দেয় না, অথচ আদায়ী টাকার জন্যে খাতকের নামে নালিশ করে। চক্রবৃদ্ধি-হারের সুদের এক আধলা রেহাই দেবে না খাতককে।

বিকেল একটু মেঘ করেছিল। গঙ্গাচরণের দোকানে কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলুম। আমি বললুম—কি রাঁধলেন, কবিরাজ মশাই?—কণ্টিকারীর ফল ভাজা আর ভাত। এই কবিরাজটি বড় অদ্ভুত মানুষ। বয়স প্রায় সত্তর হবে, কিন্তু সদানন্দ, মুক্তপ্রাণ লোক। কোন্ দেশ থেকে এদেশে এসেচে কেউ জানে না। বিশেষ কিছু হয় না এই অজ পাড়াগাঁয়ে। তবুওআছে, বলে—এদেশের ওপর মায়া বসে গিয়েচে। সোঁদালি ফুল দিয়ে একটা বালিশ তৈরী করেচে, সেই মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকে।

একটু পরে ঘন মেঘ করে এল। বেলেডাঙার ওপারে বাঁশবনের মাথার ওপরকার আকাশে সে কি সুনীল নিবিড় মেঘসজ্জা! মেঘের কোলে আবার একসারি বক উড়ল। কি রূপ যে হল, আমি বৃষ্টির ভয়ে পালাচ্ছিলুম, কিন্তু সৌন্দর্য দেখে আর নড়তে পারি নে। কে একটি মেয়ে নদীর এপারে কালো চুলের রাশি খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কি চমৎকার ছবিটি !

আজ বেশ মনের আনন্দ নিয়েই সকাল সকাল বেলেডাঙা গিয়েছিলুম। তখনও চারটের গাড়ি যায় নি। গঙ্গাচরণের দোকান খোলে নি। আইনদ্দির বাড়িতে তেলপড়া নেবার জন্যে পাঁচী পাঠিয়েছিল আমার সঙ্গে জগোকে

ও বুধোকে। আইনদ্দির বাড়িতে ছেলেবেলাতে একবার গিয়েছিলুম, ওর ছেলে আহাদ মণ্ডল তখন বেঁচে ছিল। আইনদ্দির বাড়িটা কি চমৎকার স্থানে। সেখান থেকে দূরের মেঘভরা আকাশের নীচে প্রাচীন বট অশ্বত্থের সারি কি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আইনদ্দি চক্‌মকি ঠুকে সোলা ধরিয়ে তামাক সাজলে ও একটা সোলা ফুটো করে আমায় তামাক খেতে দিলে। তারপর সে কত গল্প করলে বসে বসে। ১২৯২ সালে সে প্রথম এদেশে এসে বাস করে। তখন তার বয়সেও বিয়াল্লিশ বছর। সে বছর বন্যার জল উঠেছিল তার উঠোনে। মরা গাঙ তখন ইছামতী ছিল, একথা কাল মতি মণ্ডলও জলের ওপর দাঁড়িয়ে আমায় বলেছিল। আইনদ্দি বললে—বড্ড ফুর্তি করেচি মশাই, যাত্রার দলে গাওনা করেচি, বহুরূপী সেজেচি, বেহালা বাজিয়েচি। আপনাদের শাস্তরটা খুব পড়েচি। ধরো গিয়ে বের্‌ষোকেতু, সীতার বনবাস, বিদ্যেসুন্দর সব আমার মুখস্থ। তারপর সে 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে খানিকটা মুখস্থ বলে গেল। মহাভারত থেকে 'দাতাকর্ণ' খানিকটা বললে। এখন ওর বয়েস নব্বইয়ের কাছাকাছি, এই বয়সও সে নিজে চাষবাস দেখে। সে হিসাবে আমি তো নব্য যুবক। আমার সামনে এখন কত সময় পড়ে আছে। মনে করলে কত কাজ করতে পারি। কাল মতি মণ্ডলকে ঘুনি তুলতে দেখেও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল।

আইনদ্দির বাড়ি থেকে সুন্দরপুরের পথে খানিকটা বেড়াতে গেলুম। মরাগাঙের বাঁকে দাঁড়িয়ে আরামডাঙার ওপারের চক্রাকার আকাশের নীলমেঘের সজ্জার দৃশ্য যেন মনকে কতদূরে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল।

পথে আসতে আসতে একটা করুণ দৃশ্য দেখে সন্ধ্যাবেলাটা মন বড় খারাপ হয়ে গেল। গোয়ালাদের একটা ছোট মেয়েকে তার মা ঘরের উঠোনে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারচে, আর মেয়েটা কাঁদচে। আহা, নিজের সন্তানের ওপর অত নিষ্ঠুরভাবে হাত ওঠায় কি করে তাই ভাবি! কি করবো, আমার কিছুই করবার নেই। এদিকে বৃষ্টি পড়চে টিপ্ টিপ্ করে, সঙ্গে দুটো ছোট ছোট ছেলে, তাড়াতাড়ি কুঠীর মাঠের বনের পথ দিয়ে আমাদের আর বছরের চড়ুইভাতির জায়গাটা বুধোকে আর জগোকে একবার দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলুম।

আজ দিনটা মেঘে মেঘে কেটেচে। কিন্তু সকালবেলায় একটু সূর্যের মুখ দেখেছিলুম। মেঘ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। দুপুরে ঘুমুচ্চি, জগো এসে ওঠালে। একটু পরে খুকুও এল। জানলার গরাদটা ধরে দাঁড়িয়ে তার নানা গল্প। তার মাথা নেই, লেখাপড়া কি করে হবে... এই সব কথা। আমার কর্তব্য হিসাবে তাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলুম। তারপর পাঁচীকে আর ওকে রোয়াকে বসে সূর্য ও গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বললুম। খুকু বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনলে। বললে, এ আমার বেশ ভাল লাগে। সূর্য সম্বন্ধে কিছুই জানতুম না। আরও বলবেন একদিন।

তারপর আমি বেলেডাঙার মাঠে বেড়াতে বার হলাম। কি সুন্দর বিকেলটা আজ! ঠাণ্ডাঅথচ পথঘাট শুক্‌নো খটখট করচে। মাঠের গাছপালাতে সোনালী রোদ পড়েছে। কুঠীর মাঠে যেতে যেতে প্রত্যেক সোঁদালি গাছ, ঝোপঝাপ, বাঁশবন আমার মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করচে। নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে তাই মনের আনন্দ জানালুম। কুঠীর মাঠে ঘাসের ওপর জল বেধে আছে।

কবিরাজ ও গঙ্গাচরণ পথের ধারে মাদুর পেতে বট-অশ্বত্থের ছায়ায় বসে গল্প করচে। কাপড় কেটে কবিরাজ নিজেই জামা সেলাই করচে। শুক্‌নো ভেষজ পাতালতা কলকাতায় চালান দেবে, তারই মতলব আঁটচে। বড় ভাল লাগল বিশেষ করে আজ ওদের গল্পসল্প। আসবার সময় ছাতা নিয়ে এলুম, তখন রাত হয়ে গিয়েচে, আমাদের ঘাটে যখন নাইতে নেমেচি, আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেচে।

ক-দিনই মনে কেমন একটা অপূর্ব আনন্দ। বিশেষ করে যখনই কুঠীর মাঠে যাবার সময় হয়, তখনই সেটা বিশেষ করে হয়। কাল যখন বিকেলে ঘন নীলকৃষ্ণ মেঘ করল, তার কোলে বক উড়ল, তখন আমি সেদিকে চেয়ে এক জায়গায় বসে আছি। আবার যখন পুলের রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াই, অস্ত-আকাশের পটভূমিতে সবুজ বাঁশবনের দিকে চেয়ে থাকি, তখন আমি যেন শত-যুগজীবী অমর আত্মা হয়ে যাই। সেদিন যেমন হয়েছিল, আজও তাই হল— বেলেডাঙার ওদিকের মোড় থেকে চক্রাকৃতি দিগ্বলয়হীন শ্যাম বেণুবনের অপূর্ব শোভায় মেঘধূসর আকাশতলে মন এক অপূর্ব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন এই শুক্‌নো মরাগাঙে আবার ইছামতী বইবে, তখন

আমি কোন্ নক্ষত্রে রইবো—কতকাল পরে—কে জানে সে খবর? বাবলার সোনালী ফুল দোলানো গাছের তলা দিয়ে সেই পথ। ভাবতে ভাবতে চলে এলুম। পুলের ওপর খানিকটা দাঁড়াই। সেই কতকালের প্রাচীন বট-অশ্বত্থ, কতকালের আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ি ও বাঁশবনের সারি। মনে এ কয়দিনই সেই অপূর্ব অনুভূতিটা আছে। পুলের পাশে একটা হেলা বাবলা গাছে ফুলের কি বাহার! যখন নদীরঘাটে এসে নামলুম স্নান করতে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে শুধু বৃশ্চিকের একটা নক্ষত্র অস্পষ্টভাবে জ্বলচে। মাথার উপর দ্যুতিলোক, চারিদিকে নীরব অন্ধকার, নদীজল ও গাছপালার দিকে চেয়ে মনে যে ভাব এল, তা মানুষকে অমরতার দিকে নিয়ে যায়। বুড়ো ছকু পাড়ুই এই সময় তার স্ত্রী আদাড়িকে সঙ্গে করে নদীতে গা ধুতে এল। সে অন্ধকারে দেখতে পাবে না বলে স্ত্রী ওর সঙ্গে এসেচে।

সকালে উঠে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে আজ বড় আনন্দ পেলাম। দুপুরে পাট্‌শিমলে রওনা হওয়া গেল পায়ে হেঁটে। কবিরাজ মশায় পাঠশালায় ছেলে পড়াচ্ছেন, তাঁর কাছে বসে একটু গল্প করে বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা পথ দিয়ে মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে গিয়ে পার হলাম। কেউটে পাড়ার কাছে গিয়েচি, এক জায়গায় অনেকগুলো বেলগাছ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে। সেখানে বড় বৃষ্টি এল। পুবদিকের আকাশ বৃষ্টিধোঁয়া, নীল; পরিষ্কার সেই ইন্দ্রনীল রং-এর আকাশের পটভূমিতে দূর গ্রামের তাল-খেজুরের সারি, বাঁশবনের শীর্ষ কি চমৎকার দেখাচ্চে! আর এদিকে ঘন কালো বর্ষার মেঘ জমেচে। গোবরাপুরের মোড় বেঁকে কুঁদীপুরের বাঁওড়ের ওপারে রানীনগর বলে ছোট একটা চাষা-গাঁয়ের দৃশ্য ঠিক যেন ছবির মত। এখানে একজন বৃদ্ধাকে পথ জিজ্ঞেস করলুম। তিনি বললেন—তোমার নাম বিভূতি? সাতবেড়েতে একবার গিয়েছিলে না? আমি বললুম—হ্যাঁ। আপনি কি করে চিনলেন? তিনি নিজের পরিচয় দিলেন।গোবরাপুরের একটা দোকানে মণীন্দ্র চাটুয্যের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। সেখানে বসে একটু গল্প করেই আবার পথে বেরিয়ে পড়ি। কি ঘন বন পথের দু-ধারে। বড় বড় লতা কালো কালো গাছের গুঁড়ির গায়ে উঠেচে—এই কয়দিনের বৃষ্টিতেই গাছের তলায় বনের ছোট ছোটগাছপালার জঙ্গল বেধে গিয়েচে। 'বৌ-কথা-কও' ডাক্‌চে চারিধারে। কেউটে পাড়ার গায়ে পথের ধারের একটা সোঁদালিফুল গাছে এই আষাঢ় মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়েও অজস্র ফুল দেখছি। পাট্‌শিমলের মধ্যে কি ভীষণ tropical forest-এর রাজত্ব! ছোট ছোট জাম ফলে আছে বুনো জামগাছে—বড় বড় লতা-বনের মধ্যেটা মিশ-কালো। পাট্‌শিমলের মোহিনী কাকার সঙ্গে বাঁওড়ের ওপারে একটা চাষাগাঁয়ে দেখা হল। তিনি আমার সঙ্গে গেলেন প্রায় বাগান গাঁ পর্যন্ত। পিসিমার বাড়ি গেলুম তখন সন্ধ্যা হয়েচে। পিসিমার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করা গেল। সকালে কোদ্‌লার জলে নাইতে গিয়ে দেখি সে টলটলে জল আর নেই নদীর—কচুরিপানায় নদী মজে গিয়েচে, জল রাঙা, ঘোলা—সেইটুকু জলে সব লোকে নাইচে, গোরু বাছুরের গা ধোয়াচ্চে।

পরদিন সকালে খাওয়া-দাওয়া করে বৃষ্টি মাথায় আবার বাড়ি রওনা হই। সারাপথটা বর্ষা আর বাদলা—কিন্তু খুব ঠাণ্ডা দিনটা। আবার সেই ঘন বন—পাটু-শিমলে থেকে গোবরাপুরের পথে দু-জন চাষা-লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে এলুম। আবার সেই ঘন tropical forest-এর মত বন, বড় বড় কাছির মত লতা—পথ নির্জন, টুপ্‌টাপ করে জল ঝরে পড়ছে গাছের মাথা থেকে, আরণ্যশোভা কি অদ্ভুত! রানীনগরের এপারে একটা সাঁকোর ওপর কতক্ষণ বসে বসে নীল আকাশের পটভূমিতে আঁকা গ্রামসীমার বাঁশবনের দিকে চেয়ে রইলুম। মোল্লাহাটির ঘাট যখন পার হই তখনও খুব বেলা আছে। আজ মোল্লাহাটির হাটবার, হাটে গিয়ে একটা আনারসের দর করলুম। সুন্দরপুরের গোয়ালাদের একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হল। মনে পড়ছিল আজ ওবেলা যখন আসছিলুম পাট্‌শিমলের ঘন ক্ষুদে জামবনের মধ্যের সেই পথটা দিয়ে —মনে হচ্ছিল আমি একজন বন্ধনহীন মুক্ত পথিক, দেশে দেশে এই অপূর্ব রূপলোকের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই আমার জীবনের পেশা। কি আনন্দ যে হয়েছিল, কি অপূর্ব পুলক, মুক্তির সে কি অমৃতময়ী বাণী! কেন মানুষে ঘরে থাকে তাই ভাবি। আর কেনই বা পয়সা খরচ করে মোটরে কি

রেলের গাড়িতে বেড়ায়? পায়ে হেঁটে পথ চলার মত আনন্দ কিসে আছে? সে একমাত্র আছে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ আমি জানি। তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না।

মোল্লাহাটির হাট ছাড়িয়েচি, পথে আমাদের গাঁয়ের গণেশ মুচি নক্‌ফুল গ্রামে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছে। ওকে দেখে বড় আনন্দ হয়—শান্ত, সরল, সাধু-প্রকৃতির লোক বলে বাল্যকাল থেকে ওকে আপনার-জনের মত দেখি।

বেলা যাব-যাব হয়েচে দেখে একটু জোর-পায়ে পথ হাঁটতে শুরু করলুম। খুব রাঙা রোদ উঠেচে চারিধারে। খাবরাপোতা ছাড়লুম, সাম্‌নে আইনদ্দির বাড়ির পেছনের প্রাচীন বটগাছটা, আইনদ্দির বাড়ির মোড় থেকে দেখতে পাওয়া সেই দূরপ্রসারী দিগ্বলয়—আজ আবার মেঘভাঙা রাঙা অস্ত-সূর্যের রোদ পড়েচে দূরের সেই সব বাঁশবন, শিমুলবনের মাথায়, ঝিঙেক্ষেতে ফুল ফুটচে, বৈশাখের গায়ক পাখি পাপিয়া আর 'বৌ-কথা-কও' চারিদিকে ডাক্‌চে, বেলেডাঙার হাজারী ঘোষ গোরুর পাল নিয়ে নতিডাঙার খড়ের মাঠ থেকে বাড়ি ফিরচে, মেয়েরা মরগাঙের ঘাট থেকে কলসী করে জল নিয়ে যাচ্ছে,—কি সুন্দর শান্ত গ্রাম্য দৃশ্য, একবার মনে হল পাট্‌শিমলের সেই কালীবাড়ি ও দেবোত্তর বাঁশঝাড়ের কথা। আজ দুপুরবেলা সেখানে ছিলাম, কালীবাড়ির পেছনের এক গৃহস্থের বাড়ির বৌ প্রতিবেশিনীকে ডেকে বলছিল—ও সেজ বৌ, একটু তরকারী দেবো, খুকীকে দিয়ে বাটি পাঠিয়ে দ্যাও তো!

সন্ধ্যার আগে কতদূর এসে গিয়েচি। সন্ধ্যাও হল, বাড়ি এসে পা দিলাম, আমার চলাও ফুরুল।

আজ শরতের অপূর্ব দুপুরে পাগল করেচে আমায়। অনেকদিন লিখি নি—নানা গোলমালেঅবসাদে মনটা ভাল ছিল না—আজ রবিবার দিনটা দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠেচি—কি পরিপূর্ণ ঝলমলে শরতের দুপুর! এর সঙ্গে জীবনের কি যে একটা বড় যোগ আছে—ভাদ্রমাসের এই রোদভরা দুপুরে কেন যে আমায় পাগল করে তোলে! বনে বনে মটরলতার কথা মনে পড়ে, ইছামতীর ঘোলা জল, পাখির ডাক—মনটা যেন কোথায় টেনে নিয়ে যায়। সব কথা প্রকাশ করা যায় না—কারণ আনন্দের সবটা কারণ আমারই কি জানা আছে? কি করচে খুকু এই শরৎ-দুপুরে, বকুলতলায় ছায়ায় ছায়ায়, একথাও মনে এসেছে। ওর কথা ভেবে কষ্ট হয় যে ওর লেখাপড়া হল না।

কাল দিনটি বড় সুন্দর কেটেচে, তাই আজ মনে হচ্চে আজ সকালটিও বড় চমৎকার। অনেকদিন কলকাতায় একঘেয়ে জীবনযাত্রার পরে কাল বাড়ি গিয়েছিলুম। প্রথমেই তো খয়রামারির মাঠে দুপুরের রোদে বেড়াতে গিয়ে সবুজ গাছপালা লতাপাতার গন্ধে নতুন জীবন অনুভব করলুম। হাওয়াতেও একটা তাজা গন্ধ আছে যা কিন্তু শহরে নেই। ঝোপে থোলো থোলো মাখম শিমের নীলফুল ফুটেচে, মটরলতার সবুজ ফল ও সোঁদালি গাছের কাঁচা সুঁটি বন-জঙ্গলের শোভা কত বাড়িয়েচে—তাদের ওপর আছে শরতের মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ, আর আছে তপ্ত সূর্যালোক। প্রতিবারই দেখেচি নতুন যখন কলকাতা থেকে আসি এমন একটা আনন্দ পাই। মনে হয় এই তো নীলাকাশ আছে মাথার ওপর, চারিপাশে বেষ্টন করে রয়েছে ঘন সবুজ গাছপালার ঝোপ, পাখির ডাক আছে, বনফুলের দুলুনিও আছে— এ থেকে তো এতই আনন্দ পাচ্চি—তবে কেন মিথ্যে পয়সা খরচ করে দূরে যাই! দূর আমায় কি দেবে, এমন কি দেবে, যা এখানে আমি পাচ্চি নে? আসল কথা দূরও কিছু নয়, নিকটও কিছু নয়—প্রকৃতি থেকে আনন্দ সংগ্রহ করবার মত মনের অবস্থা তৈরী হয়ে যদি যায় তবে যে কোনো জায়গায় বসে দুটো গাছপালা, একটুখানি সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, দুটো বন্য পক্ষীর কলকাকলী, বনফুলের শোভাতেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায়।

কাল বারাকপুরে গেলুম সকালবেলা। দুপুরে ইছামতীতে স্নান করতে গিয়ে সত্যি বড় আনন্দ পেয়েচি। কূলে কূলে ভরা নদী, দু-ধারে অজস্র কাশফুল, আরও কত কি লতা, ঝোপ, বর্ষার জলে সব ঘনসবুজ—চক্‌চক্‌ করচে কালো কচুর পাতা, মাখম শিমের নীল ফুল ফুটেচে—একটা গাছে সাদা সাদা বড় বড় ঢোল-কলমীর ফুলও দেখলুম।

বৈকালে যখন খুকু, আমি আর কালা নৌকাতে বনগ্রামে আসি, তখনও দেখলুম দু-ধারে গাছপালার কি অপরূপ রূপ, বনের ফুলের কি শোভা!

ছকু মাঝিকে জিজ্ঞেস্ করলুম—ওটা কি ফুল ছকু? ছকু বললে—কোয়ারা...

খুকুকে কাশফুল দিয়ে একটা বাংলা সেন্টেন্স তৈরি করতে দিলাম।

রাঙা-রোদ-বৈকালটি মেঘমুক্ত আকাশে, নদীতীরে অপূর্ব শোভা বিস্তার করচে।

কাল রাত্রের ট্রেনে তারাভরা আকাশের তলা দিয়ে যখন এলুম, সেও বেশ লাগছিল।

আজ স্কুলের ছুটি হবে। সুন্দর প্রভাতটি।

আজ সকালটি বড় সুন্দর। গুয়া নদীতে হাতমুখ ধুয়ে এসে বটতলায় এসেচি—দূরে সবুজ পাহাড়শ্রেণী—সকালের হাওয়ায় একটু যেন শীতের আমেজ। কাল ঘন জঙ্গলের পথে আমরা অনেকদূর গিয়েছিলুম, পথে পড়ল দুখানা সাঁওতালী গ্রাম—বরমডেরা ও কুলামাতো। আর—বছর যে রাস্তা ধরে সাটকিটা গ্রামে যাই, এবার সে রাস্তায় না গিয়ে চললুম সোজা ধনঝরি পাহাড়ের দিকে। বামে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি। সামনে ডাইনে পিছনে চারিদিকেই পাহাড়। নীলঝরনার ওদিকের পাহাড়ের বড় বড় সামনের চাঁইগুলি নীল আকাশের পটভূমিতে লেখা আছে। ছোটএকটি পাহাড়ী ঝরনা এক জায়গায়। ঝরনা পার হয়ে দু-ধারে শাল, মহুয়া, তমালের বন, বুনো শিউলি গাছও আছে। একটা ভাল জায়গা দেখে নিয়ে আমরা চা খাবো ঠিক করলুম। বন সামনের দিকে ক্রমেই ঘন হচ্ছে, ক্রমে একধারে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, বড় বড় বনের গাছে ভরা আর বাঁদিকে অনেক নিচে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছপালার মধ্য দিয়ে। আমরা দূর থেকে ওর জলের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। সবাই মিলে নেমে গিয়ে বড় বড় গাছ ও মোটা কাছির মত লতা দিয়ে তৈরী প্রকৃতির একটি ছায়াশীতল ঘন কুঞ্জবনে একখানা বড় চৌরস কালো শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসে চা-পান করা গেল। টাঙি হাতে একজন সাঁওতাল জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তে যাচ্চে, বললে—বেশী দেরি করবেন না, একটু পরে এখানে বুনো হাতি জল খেতে নামবে। গাছপালার মাথায় মাথায় শরতের অপরাহ্ণের রাঙা রোদ। সামনে পেছনে বড় বড় পাথর, একখানার ওপর আর একখানা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেচে—ওদিকে আরও ঘন জঙ্গলের দিকে ঝরনার পথ ধরে খানিকটা বেড়িয়েও এলুম। বেলা পড়লে রওনা হয়ে ছায়াভরা পার্বত্যপথে হেঁটে আমরা এলুম নীলঝরনার উপত্যকার মুখ পর্যন্ত। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি মাথা খাড়া করে আছে। আশেপাশের বন্য সৌন্দর্য সন্ধ্যার ছায়ায় আরও সুন্দরতর হয়েচে—সেইদিনই যে সুদূর পথে ইছামতীতে আসবার সময় আমাদের ভিটেটাতে গিয়ে মায়ের কড়াখানা দেখেছিলুম—সে কথা মনে পড়চে। নীরদবাবু ও আমি নীল ঝরনা বেড়িয়ে অনেক রাত্রে বাংলাতে ফিরি।

সকালে উঠে সুবর্ণরেখার পুলের ধারে মাছ কিনতে এলুম। সকালটি বড় চমৎকার, নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে চাইলে কত কালের কত সব কথা মনে পড়ে! পুল থেকে চারিধারে চেয়ে দেখি মাছ বা জলের সম্পর্কও নেই কোনো ধারে। নিচে নেমে ছায়ায় একটা শিলাখণ্ডে অনেকক্ষণ বসে রইলুম—ভাবচি সুপ্রভার পত্রের আজ একটা উত্তর দেব। ওখান থেকে ফিরে এসে বাংলোর পেছনে যে পাহাড়ী নদী—তাতে নাইতে গেলুম আমি আর শঙ্কর। সুন্দর নদীর ঘাটটি, পাথর একখানা বড় ঘাটে ফেলা আছে, জলের ধারে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে জলজ লিলি ফুটে রয়েচে। সামনে থৈ থৈ করচে পাহাড়শ্রেণী, ঘন সবুজ তার সানুদেশ। দূরে Governor's pool-এর কাছে একটা গাছের আঁকাবাঁকা মাথা সবুজ পাহাড়ী ঢালুর পটভূমিতে দেখা যায়। এ ক-দিনের প্রখর সূর্যালোক আর-বছরের এ সময়ে বর্ষা-বাদলের কথা মনে করিয়ে দেয়...সূর্যের আলো না থাকলে এসব পাহাড়শ্রেণী, এই পাহাড়ী নদী, এই গাছপালা—এই প্রসারতা এত ভাল লাগত? এই এখন বসে আছি বাংলোর বারান্দাতে, দূরে দূরে কালাঝোরা ও অন্যান্য পাহাড়শ্রেণী অপরাহ্ণের পড়ন্ত রোদে কি সুন্দরই না দেখাচ্চে। দুপুরে মহুলিয়ার পোস্ট মাস্টার এসেছিল, কেষ্ট আবার এসেছিল—ওরা বললে সেদিন যে হাতিঝরনায় গিয়ে চা খেয়েছিলুম, তার ওদিকে বাঁকাই বলে গ্রাম আছে, গভীর জঙ্গল তার ওপারে—ধান পাকলে নিত্য হাতির দল বার হয়। বাসাডেরা ও

ধারাগিরির পথ এখন নিরাপদ নয়, কেষ্ট বলছিল। সেদিকে এখন জঙ্গলও খুব ঘন, তাছাড়া বড় বাঘের ভয়, হয়েছে, অনেকগুলো মানুষ ও গরুকে বাঘে নিয়েছে এ বছর। সাতগুড়ুমের পথেও বাঘের উপদ্রব হয়েছে এ বছর।

পোস্ট মাস্টার বললে—আপনার জন্যে জমি রেখে দিলে বিষ্টু প্রধান, আর আপনি মোটে এলেন না! নেন যদি, জমি এখনও আছে।

বিজয়ার দিন মহুলিয়া যাবে, সেখান থেকে টাটানগর ও চাঁইবাসা।

এইমাত্র পাহাড়ের সানুদেশে বসে হালুয়া তৈরি করে চা খাওয়া গেল। মাথার ওপর অষ্টমীর চাঁদ, আকাশে দু-দশটা তারা, সামনে অরণ্যাবৃত পাহাড়ের অন্ধকার সীমারেখা, দূরে বামদিকে অরণ্য আরও গভীর, মৃদু জ্যোৎস্নালোকে পাহাড়, উপত্যকা, সানুদেশস্থ বনানী অদ্ভুত হয়েচে দেখতে। আজই পট্টনায়েকবাবু বলেছিল ৪নং shift-এ বাঘ আছে, সেজন্যে সন্ধ্যারপরে আমাদের সকলেরই গা ছম্‌ছম্‌ করচে। রামধন কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখেচে পাছে বাঘভাল্লুক আসে সেই ভয়ে। কেবলই মনে পড়তে থাকে আজ মহাষ্টমীর সন্ধ্যা, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এই সময়টিতে পুজোর চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর আরতি হচ্ছে শঙ্খ-ঘণ্টা রবের মধ্যে, ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে নতুন কাপড় পরে ঘুরচে—আর আমরা সিংভূমের এক নির্জন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত পাহাড়ের মধ্যে বসে গল্প করচি ও প্রকৃতির শোভা দেখচি।[1]

ওখান থেকে ফিরচি। রুথামের মুদীর দোকানের সামনে সাঁওতালী নাচ হচ্চে, মাদল বাজার তালে তালে। আমাদের একটা কম্বল পেতে দিলে, আমরা অষ্টমীর চাদের নিচে পাহাড়ের সামনের ছোট গ্রামে খাঁটি সাঁওতালী নাচ দেখে বড় আনন্দ পেলুম। কবিরাজের সঙ্গে বসে একটু গল্প করা গেল। তার বাংলোর সামনে কবে রাত্রে চিতাবাঘ এসে দাঁড়িয়েছিল, সাঁওতালদের গোরস্থানে সেবারে ভূত দেখেছিল, ইত্যাদি কত গল্প।

মহুলিয়াতে আজ সারা দুপুর ঘুরে বেড়িয়েচি। বাদলবাবুর বাংলো থেকে কালাঝোরের দৃশ্যটি বেশ লাগল। বলরাম সায়রের ধারে সেই গাছটি, নানারকমের পটভূমিতে দুপুরের পরিপূর্ণ সূর্যালোকে কি অদ্ভুত যে দেখাচ্ছিল! তিনটের ট্রেনে গেলাম টাটানগর। বাসে কাশিডি নেমে আশুর বাসা খোঁজ করে বার করি। সে একটা গন্ধরাজ ফুলগাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দু-জনে সন্ধ্যার পরে নিউ এল্‌-টাউনে প্রতিমা দেখে এলাম। লোকজনের ভিড়, মেয়েদের ভিড়, তারপর ওল্ড এল্‌-টাউনের প্রাইমারি স্কুলে ঠাকুর দেখি। একবার আশু বাড়ি এল মোটর লরি দেখতে পাওয়া গেল না, তারা সব বর্মা জিঙ্কে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। হেঁটে বর্মা জিঙ্ক যাবার পথে ডুপ্লে প্ল্যান্ট্‌ ও slug ঢালার সময়কার রক্ত আভা থেকে মনে হল আগ্নেয়গিরি কখনো দেখি নি, বোধ হয় এই ধরনের জিনিস হবে। ওই সাদা আগুনের স্রোতের মতই তার উষ্ণ লাভা-স্রোত। বর্মা মাইন্‌সের ঠাকুর সাজিয়েচে খুব ভাল, আবার তার সামনেই একটা কৃষ্ণলীলার ছবি সাজিয়েচে। বাসে স্টেশনে জুগল্লাই ও বিষ্ণুপুর ঘুরে কাশিডি এলাম। পথে বাস হাঁকছে, 'টিন্‌প্লেট', 'বর্মা জিঙ্ক', যেমন কলকাতায় হাঁকে 'ভবানীপুর', 'আলিপুর'।

সকালে টাটানগর থেকে প্যাসেঞ্জারে বাসায় নামলুম। শ্যামপুর গ্রামখানা পাহাড়ী নদীর ঠিক ওপারে, কাঁকুরে জমি, কাছেই এদেশের ধরনের বনজঙ্গল। পথে সিংভূমের প্রকৃত রূপ দেখলুম, অর্থাৎ উচ্চাবচ ভূমি, পাথরের চাঁই, শাল ও কেঁদ গাছ, রাঙা মাঠ। তিনটের ট্রেনে মহুলিয়া থেকে বাদলবাবু, বিশ্বনাথ বসু প্রভৃতি অনেকে এল। অশ্বত্থতলায় বসে চা খাওয়া গেল। বেলা পড়ে এসেচে। দুটো বাজে। সে সময় আমি একা গেলুম পাহাড়ী নদীর ধারে শালচারার জঙ্গলে—একা বসতে। সামনে পাহাড়শ্রেণী থৈ থৈ করচে, দূরে কালাঝোরের নীল সীমারেখা নীল আকাশের কোলে। ঐ দিকে আজ বাংলাদেশে আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারে আড়ং বসেচে, কত দোকানদারের কত বেচাকেনা, কত নতুন কাপড়পরা ছেলেমেয়েদের ভিড়। পাথরের ওপর অপরাহ্ণের ঘনায়মান ছায়ায় এক

[1]এই অংশটি ৪ নং shift-এ বসে লেখা।

জায়গায় বসে চারিধারের মুক্ত প্রসারতা দেখে কেবলই বাংলাজোড়া বিজয়া দশমীর উৎসব ও কত হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের হাসিমুখ মনে পড়ল। দু-দিনের বিজয়া দশমীর কথা আমার মনে আছে ছেলেবেলাকার। যুগল কাকা সেদিন এসে রান্নাঘর ও বড়ঘরের মাঝখানে উঠোনেতে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে বিজয়ার আলিঙ্গন ও প্রণাম করলেন। ... আর যেদিন গঙ্গা বোষ্টমকে আমরা আশুদের চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্মণ ভেবে ভুলে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করেছিলুম।

আজকার দিনে যেখানে যত লোককে ভালবাসি সকলের কথাই মনে পড়ল, তাদের মধ্যে কাছে কেউই নেই, অনেকে পৃথিবীতেই নেই, কিন্তু তাদের উদ্দেশে আমার এ প্রীতিনির্দেশ হয়তো বা ব্যর্থ যাবে না।

গালুডির হরিদাস ডাক্তারের সঙ্গে অনেককাল পরে আজ দেখা। সে গিয়েছিল ধলভূমগড়ের রাজবাড়িতে রোগী দেখতে, আমরা এখানে আছি শুনে বাদলবাবুদের সঙ্গে এখানে ট্রেন থেকে নেমেচে; তার সঙ্গে জ্যোৎস্নাফুল্ল সন্ধ্যায় পাহাড়ী নদীর ধারে তপ্ত শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসলুম। অমনি যেন অন্য এক জগতে এসে পড়েচি মনে হল। দূরে নদীর কুলুকুলু জলস্রোত, ওপারের জ্যোৎস্নাশুভ্র পাহাড়শ্রেণী, খুব একটা আঁকাবাঁকা কি গাছ, আর এক প্রকারের বনফুলের মিষ্টি সুবাস—মাথার ওপরের নক্ষত্রবিরল আকাশ—সবগুলো মিলে আমায় এমন এক রাজ্যে নিয়ে গেল যে চুপ করে সেদিকে চেয়ে বসেই থাকি, হরিদাস ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা আর আমার হয় না, কথা বলবার মত মনও নেই, কেমন যেন হয়ে গেলুম। দু-জনেই চুপচাপ, কতক্ষণ বসে থেকে রাত দশটার কাছাকাছি বাংলোতে ফিরি।

বৈকালে নীলঝরনা বেড়াতে গেলুম কিন্তু বেলা গিয়েছিল বলে বেশীক্ষণ নীলঝরনার উপত্যকায় বসে থাকা সম্ভব হল না। পাহাড়ের ওপারে উৎরাই-এর পথে বনতুলসীর জঙ্গলে ঘন ছায়া নেমেচে, তার মধ্যে বড় বড় কেঁদ গাছ, সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথায় অস্তমান সূর্যের আভা একটু। ঝরনা পেরিয়ে বরম্-ডেরার পথে খানিকটা উঁচু জায়গায় পাথরের স্তূপ খুঁজচি, জনকয়েক লোক কুলামাতোর দিক থেকে আসচে, ওদের সঙ্গ নিলুম। ওরা বললে, তুই এখানে কি করছিস রে? বললাম, পাথর কিনতে এসেচি।

৪নং shift-এর কাছে এসেচি, তখনও জ্যোৎস্না ওঠে নি, মুদীর দোকানটা আজ বন্ধ, রাধাচূড়া গাছে যে ফুলের লতাটা সেদিন দেখেছিলুম, তাতে আজ আর ফুল নেই। এঞ্জিনিয়ারের বাংলোতে লোক খাটচে, কারণ ডেপুটি কনজারভেটর অফ ফরেস্টস এখানে একমাসের মধ্যে এসে বাস করবে। পট্টনায়ক যে বাংলো দেবে বলেছিল সেটা দেখলাম। বড় বড় গাছের মধ্যে বাংলোটা, বারান্দায় বসে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির দৃশ্য উপভোগ করা যায়। নিকটেই নীলঝরনা, জলের কষ্ট হবে না।

কবিরাজ নেই, ডাক্তারও নেই ওদের বাংলোতে। কবিরাজ গিয়েচে টাটানগর, ডাক্তার গিয়েচে মহুলিয়া, কাজেই বিজয়ার সম্ভাষণ এদের আর জানানো গেল না। ফিরবার পথে আমি গুররা নদীর ধারের পুলের ওপর বসে রইলুম অনেকক্ষণ। দূরে কালাঝোর জ্যোৎস্নারাত্রে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। পাহাড়ী নদীর কুলুকুলু শব্দ যেন সঙ্গীতের মত শোনাচ্চে। তামা পাহাড়ের মাথার ওপর দু-একটা তারা মনকে নিয়ে যায় অনেক দূর, কতদূর পৃথিবী পার করিয়ে অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

একটু পরে পট্টনায়েক এল পুলের ওপরকার কাঠ ধরে। আমি বসে আছি দেখে বললে, চলুন আমার বাসায়। একটু বিজয়ার মিষ্টিমুখ করবেন।

আমি বললুম—হেঁটে ক্লান্ত আছি, আজ আর নয়।

তারপর সে অনেকক্ষণ বসে নানা গল্প করলে। রাত ন'টার সময় বাড়ি ফিরি।

পশুপতিবাবু আজ আসবেন কথা ছিল, এলেন না, সেজন্যে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আমি আর নীরদবাবু[2] বেরুলাম সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে। যাওয়ার পথে অপরাহ্ণের ঘনছায়া নেমে এসেছে পাহাড়ের অধিত্যকায়, তার কোলে-কোলে এদিকে ওদিকে চারিদিকে সাদা সাদা বকের দল উড়চে। সমস্ত দিনের অবসাদ একমুহূর্তে কেটে গেল যেন, সেদিকের অপরূপ সন্ধ্যার পানে চাইলুম। ওখান থেকে এসে নীলঝরনার দিকে চলি। তামা পাহাড়ের ওপর উঠলুম পিয়ালতলা দিয়ে। বড় বটগাছটাতে একরাশ জোনাকি জ্বলচে, ওধারে উঠেচে ত্রয়োদশীর চাঁদ, তামা পাহাড়ের বিরাট অধিত্যকার গায়ে পুব থেকে পশ্চিমে দীর্ঘ বড় বড় ছায়া পড়েচে। আমরা দু-ধারে পাহাড়ের গিরিপথটা পার হয়ে নামলুম ওপারের জ্যোৎস্নাশুভ্র উপত্যকায়। বনতুলসীর জঙ্গল আর তার মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে শাল ও তমাল। চারিধারে রূপ যেন থৈ থৈ করচে। পাহাড়ের মাথায় এদিকে ওদিকে দু-চারটি নক্ষত্র।

নীলঝরনার জল পার হয়ে বরম্‌ডেরার পথে একজন পাহাড়ী লোকের সঙ্গে দেখা। সে একা একটা লাঠি হাতে গান গাইতে গাইতে চলেচে কুলামাতোর দিকে। তাকে বললাম—অত জঙ্গলে এত রাত্রে একা যাবি, যদি বাঘের হাতে পড়িস্!

সে বললে—খেদিয়ে দিব বাবু।

অর্থাৎ সে লাঠি দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেবে। আমরা আর একটু এগিয়ে যেতেই চারিধারের পাহাড়ী অধিত্যকার নির্জনতায় জ্যোৎস্না-ধৌত সৌন্দর্যে যেন কেমন হয়ে গিয়েচি। একটা ভারি আশ্চর্য জিনিস দেখা গেল। দূরে ধঞ্জরী শৈলমালার গায়ে একটা নক্ষত্র জ্বলছিল, খানিকক্ষণ থেকে সেটা আমরা দেখচি। আর আমি মাঝে মাঝে দেখচি ডাইনের রুথাম্ পাহাড়ের দিকে, বাংলাদেশের আলোছায়াভরা কোজাগরী পূর্ণিমারাত্রের কথা ভাবচি, এমন সময় নক্ষত্রটা যেন টুপ করে খসে গেল পাহাড়ের ঢালু থেকে। আর সেটা দেখা গেল না। আমরা দু-জনেই অবাক হয়ে রইলুম।

সবুজ ঝরনার কাছে এসে বসলুম, ওখানে একটি সুবৃহৎ শিমুল গাছের শাখা নত হয়ে আছে। ঝরনার জলের ওপর কুলুকুলু ক্ষীণ শব্দ হচ্চে ঝরনার জলধারার, জ্যোৎস্নারাত্রে ঝরনার জল চিক্‌চিক্ করচে, বড় শিমুল গাছের মাথায় একরাশ জোনাকি জ্বলচে, সে এক অপরূপ ছবি। ছবিটা বহুদিন মনে থাকবে। তারপর রুথামের পাহাড়ের একেবারে মাথায় একটা বড় শিলাখণ্ডের ওপরে উঠে বলি। যেদিকে চাই, জ্যোৎস্নাবিধৌত বনরাজিশোভিত শৈলমালা, দূরে টাটার কারখানার রক্ত-আভা যেন বহুদূরের কোন অজানা আগ্নেয়গিরি অগ্নিগহ্বরের রক্তশিখার আভা বলে মনে হচ্ছে। পিছন দিকের ঢালুটা সহজ বলে মনে হল, সেখানেই নেমে জঙ্গলের মধ্যে পথ ঠিক করতে পারচি নে। নারীকণ্ঠে বললে কে, এদিক দিয়ে বাবু! চেয়ে দেখি নিচে একটা সাঁওতালদের ঘর। নেমে এলুম তাদের উঠোনে। দুটি মেয়ে ওএকটি পুরুষ উঠোনে আগুন জ্বেলে সম্ভবত আগুন পোয়াচ্চে।

আমরা তাদের জিজ্ঞেস করলুম—এই বনে পাহাড়ের নিচে আছিস্ কেমন করে, হাতি বাঘ নামে না?

তারা সবাই দেখলুম অদৃষ্টবাদী। বললে—বাবু, ভয় করে কি হবে? যেদিন বাঘে নেবে সেদিন নেবেই।

রুথাম থেকে আমাদের বাংলো প্রায় দু-মাইল, এদিকে রাত হয়েচে, ন-টা বাজে। আর বেশীক্ষণ এসব জায়গায় থাকা ভাল নয় বুঝে দু'জনে বেশ জোরপায়ে হেঁটে রাত পৌনে দশটায় পরিপূর্ণ ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে বাংলোতে পৌঁছে গেলাম।

আজকার রাতের জ্যোৎস্নাটি আমাকে ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কেন এত? Shuqul সাহেবের বাগানের মধ্যের গাছগুলো ঠিক যেন ইসমাইলপুর কাছারির চারিপাশের সেই বনঝাউ গাছ। আহারাদির পরে

[2]নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

বাংলোর সামনে বসে গল্প করচি, একটা প্রকাণ্ড উল্কা জ্বলতে জ্বলতে অত জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও ঠিক যেন হাউই-বাজির মত আগুনের রেখা সৃষ্টি করে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

ভারি সুন্দর ভূমিশ্রী সিংভূমের, ভারি চমৎকার জ্যোৎস্না-রাত্রিটা আজ! অনেককাল এদের কথা মনে থাকবে।

রাখামাইন্‌স্ থেকে এসেও যখন বারাকপুরের এই গাছগুলোর গন্ধ, ছায়া ও শ্যামলতা আমাকে এত মুগ্ধ করেচে তখন আমাদের এ অঞ্চলের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার মত আরও দৃঢ় হয়ে গেল সন্দেহ নেই। সকালে একটু রোদ উঠলে যখন গাছপালায়, ঝোপে, ছায়ায় ছায়ায় বেড়ানো যায় তখন যে বনলতার কটুতিক্ত সৌরভ, বনফুলের সুবাস পাই, পাখির যে কলকাকলী শুনি, কোথায় এর তুলনা? পাহাড়শ্রেণী না থাকলে রাখামাইন্‌স্ তো মরুভূমি। তবে পাহাড়ের ওপরকার বন সকালের ছায়ায় ভাল হয় কিন্তু কেন জানি না সেখানে এ ধরনের কোমলতা নেই, স্নিগ্ধ নয়রুক্ষ। শাল তমাল গাছের বৈচিত্র্য নেই, তারা মোহ সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের বনে লতা নেই, প্রাকৃতিক কুঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে এমন পুষ্পিত বৃক্ষ বা লতা নেই। এই সবের জন্যেই তো প্রথম হেমন্তে দেশের বন এত ভাল লাগে। সুস্মিত জ্যোৎস্নারাতে কোথায় এমন পুষ্পিত তৃণপর্ণের মন-মাতানো সৌরভ!

কাল বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে কুঠির মাঠের বনশোভা দেখে আরও বেশী করে আমার থিওরিটার সত্যতা উপলব্ধি করলম অর্থাৎ আমাদের এ অঞ্চলের গাছপালার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সিংভূম সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ার অরণ্যের শোভার অপেক্ষা অনেক বেশী। কত কি লতা, কত কি বিচিত্র বনফুল, কত ধরনের পত্রবিন্যাস—এত বৈচিত্র্য কোথায় ওসব দেশের অরণ্যে ? আমি রাখামাইন্‌স্ থেকে বারো মাইল পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সবটাই হেঁটে মুসাবনি রোড পর্যন্ত গিয়েচি, সিংভূমের বিখ্যাত সারেন্ডা ফরেস্ট দেখেচি, গবর্নমেন্ট প্রোটেক্টেড্ ফরেস্টের মধ্যে গিয়েচি। সেখানে বন খুব ঘন ও বহুবিস্তৃত বটে কিন্তু বনশোভা নিম্নবঙ্গের বনের মত নয়। ও অঞ্চলের বড় বড় গাছের মধ্যে শাল, কেঁদ, আসান, পলাশ ও মাঝে মাঝে আমলকী ও বন্য শেফালী এই ক'টি প্রধান। বন্যলতা আমার চোখে অন্তত পড়ে নি। কোন কোন স্থানে শিমুল বৃক্ষ আছে। সারবান কাঠ বাংলাদেশের বনে তত নেই যত ওদেশে আছে, কিন্তু আমার বলবার উদ্দেশ্য বাংলা দেশটাতে যদি আজ সারেন্ডা রিজার্ভ ফরেস্টের মত একটা অরণ্য গড়ে উঠত, তার বনবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য এবং নিবিড়তা অনেক বেশী হত— শ্রীনগরের ও ছঘরের পথের ধারের বন দেখে এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েচে। তবে বাংলার বনে পাহাড়ী নদী বা ঝরনা নেই, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডও নেই—তেমনি ওসব বনের পথে এত পাখি নেই, বিচিত্র বর্ণের বনপুষ্পের সুবাস নেই।

এ আমি স্বীকার করি যদি বাংলাদেশের বনভূমির পিছনে থাকত দূরবিস্তৃত নীল গিরিমালা, মাঝে মাঝে যদি কানে আসত পাহাড়ী ঝরনার কুলুকুলু শব্দ, শিলাসন আস্তৃত থাকত স্নিগ্ধ ছায়াঝোপের নীচে, চরত ময়ূর, চরত হরিণ-নন্দন—উপলাকীর্ণ বন্য নদীর শিলাময় দুই তটে স্তবকে স্তবকে সুবাসভরা বনকুসুম ফুটে থাকত—গিরি-সানুদেশে থাকত ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁশবন—তবে এ বন আরও সুন্দর হত।

কল্পলোক ছাড়া সে বন কোথায়—যেখানে এত সৌন্দর্যের একত্র সমাবেশ সম্ভব? অন্তত আমি তো দেখি নি।

যদিও কোথাও এমন থাকে ভারতবর্ষের মধ্যে, তবে আমার সন্দেহ হয়, তা আছে বা থাকা সম্ভব গোদাবরীতীরের অরণ্যে, রাজমহেন্দ্র থেকে গোদাবরীর উজানপথে গিয়ে উতকামন্দ ও কোদাইকানাল অঞ্চলে। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের রিজার্ভ ফরেস্ট, হিমালয়ের নিম্ন অধিত্যকায়, আসামের বনে। যদিও এদেশের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করচি তা আছে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ।

আজ মনে বড় আনন্দ ছিল। জগো আর গোপালকে সঙ্গে নিয়ে বনফুলের সুবাসভরাবনপথ দিয়ে বেলেডাঙার আইনদ্দির মণ্ডলের বাড়ি গেলাম। আইনদ্দি যত্ন করে বসালে— ও নিজে কত গ্রামে পরিচিত সে গল্প করলে, 'বহুরূপী সেজেছি বাপু, কাটামুণ্ডুর খেলা খেলেচি—নাগরদোলা ঘুরিয়েচি।'

আমি ওকে খুশি করবার জন্যে বললুম—চাচা, তোমাকে অনেক দূরের লোকে জানে।

ও বড় খুশি হল। বললে–শোন তবে আমায় কত গাঁয়ের লোকে জানে। এই কাট্‌কোমরা, ইচ্ছেপুর, মেটিরি, শুল্‌কো, হানিডাঙা...

তার তালিকা আর শেষ হয় না।

বললে—তা লাঠিতে বা বন্দুকে মরব না, আমার গুরুর কৃপায়। আগুন খাব। শূন্যে উড়ে যাব। মুণ্ডু কেটে আবার জোড়া দেব।

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—বল কি চাচা?

—হ্যাঁ, তোমার বাপ-মার আশীর্বাদে গুণ কিছু ছেল শরীলে। ওই সেখানে চটকাতলায় সায়ের ছেল, ওখানে এক সন্ন্যাসী এসে আস্তানা বাঁধে আজ চল্লিশ বছর আগে। আমার তখন অনুরাগ বয়েস। তিনিই আমার ওস্তাদ।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে দেখে উঠলুম। জগো, গোপাল ও আমি ঘন বনের পথে আবার ফিরি। তখন কুঠীর মাঠের জঙ্গলে অন্ধকার বড্ড ঘন হয়েচে। ওরা বাঘের ভয়ে বনের মধ্যে কথাবার্তা বলে না। আমি যত সাহস দিই, ওরা তত ভয় করে।

আমাদের ঘাটে যখন এসেচি, তখন নিস্তব্ধ নদীচরের ওপরকার আকাশে অগণ্য দ্যুতিলোক—বনশিমের ফুল ফোটা ঝোপটি ঘাটের ওপর নত হয়ে আছে, জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে ফাঁকে ফাঁকে।

বাড়ি এসে দেখি সবাই বাড়ির চারিদিকে প্রদীপ জ্বেলেচে, কারণ আজ দীপ দান করবার নিয়ম। ক্ষুদুদের বোধনতলায়, আমার লেখ্‌বার ঘরের সামনে, পুঁটিদিদিদের রোয়াকে, খিড়কির পথে, বাঁশবনে—সর্বত্র প্রদীপ জ্বলচে।

ন-দি হেসে বললে—এই দ্যাখো, এবার তোমাদের কলকাতার হ্যারিসন রোড হয়ে গিয়েছে, না।

ক-দিনই বড় আনন্দে কাটল। আজ দুপুরে একটা মালো এলো সাপ খেলাতে। আমতলায় চেয়ার পেতে আমরা সবাই বসে সাপ খেলানো দেখি। ন-দি, খুড়িমা, ক্ষুদু, পাঁচী, জগো, গোপাল—সাপ খেলা দেখে সবাই খুশী। এবার পুজোর ছুটিতে যত গান শুনেচি, দুটো গান আমার মনে বড় ছাপ রেখে গিয়েচে, গানের সুরের জন্যে নয়, যে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ অবস্থায় সেই গান দুটি গাওয়া হয়েছিল তার জন্যে। সেদিন পাহাড় পেরিয়ে এসে রুথামের মুদীর দোকানে একটা ছোকরা যে গাইছিল :—

হায় হায় শিশুকালে ছিলাম সুখে...

এ গানটার এই পর্যন্ত মনে আছে। আর একটা আজকার সাপুড়ের গানটা :—

সোনার বরণ লখাই আমার হয়ে গেল কালো

(ওগো) কি সাপে দংশেচে তারে তাই আমাকে বলো।

সাপুড়ে উচ্চারণ করলে—'ডুংশেচে'—তাই যেন আরো মিষ্টি লাগলো।

তার পরেই রোদপড়ল। কুঠীর মাঠে বনঝোপের ধারে কেলেকোঁড়ার লতায় ফুলের সুগন্ধে বৈকালের বাতাস ভারাক্রান্ত। তারই মধ্যে কতক্ষণ বলে রইলুম, বেড়ালুম। ছেলেমানুষের মত প্রকাণ্ড মাঠটার এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করে বেরিয়ে আবার যেন বাল্যের আমোদ ফিরিয়ে পেলুম। ভাগ্যে ওদিকে কেউ লোকজন থাকে না, তাহলে আমাকে হয়তো ভাবতো পাগল।

পল্লীপ্রান্তের বনশোভা ও বনপুষ্পের সুবাস আর এবারকার অপ্রতিহত পরিপূর্ণ তপ্তসূর্যালোক—তার ওপর সব সময়ের জন্যে মাথার ওপরকার ঘন নীল আকাশ—আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছে। দিনরাত এই মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বাস করেও যেন আমার আশ মেটে না—রাত্রির নক্ষত্ররাজি কি জ্বলজ্বলে, কত রকমের, দিক্‌বিদিকে কতদূর ছড়ানো।

বেজায় শীত পড়লো শেষরাত্রে। সকালে নদীর ঘাট থেকে ফিরচি, আমাদের ঘাটের পথে গাবতলায় সাত-আটখানা বড় বড় মাকড়সার জাল পাতা। রোদ পড়ে বিচিত্র ইন্দ্রধনুর রং-এর সৃষ্টি করেচে। আমগাছের এডালে ওডালে টানা বেঁধে উঁচুতে নিচুতে কেমন জাল বুনেচে। প্রত্যেক জালেতে গোটাকতক মশা মরে রয়েচে। একটা মাকড়সা জাল গুটিয়ে একটা মাত্র টানার সুতোতে পর্যবসিত করলে—সেই সুতোটা বেয়ে ছোট্ট মাকড়সাটা গাব গাছের ডালে উঠে গেল। বনে বনে এই সব দেখে বেড়ালেও কত শিক্ষা হয়। আমাদের দেশে কত ফুল, ফল, দামী ঝোপঝাপ, কীটপতঙ্গ। এদের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে যে আনন্দ পাওয়া যায়—একরাশ প্রাণীবিজ্ঞানের বই ঘাঁটলেও তা হয় না।

"We live too much in books and not enough in nature, and we are very like that simpleton of a Pliner the younger who went on studying a Greek author while before his very eyes Vesuvious was overwhelming fine cities beneath the ashes."

তারপর কতক্ষণ দুপুরে মানুদের বাড়ি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার নিমন্ত্রণে গিয়ে ওদের সঙ্গে বসে গল্প করলুম। কে বলেছিল ‘অন্ধ নাচার বাবা’, ক্ষুদু খুব উৎসাহের সঙ্গে সে গল্প করলে। আমি বনপথ দিয়ে তালঘাট গেলাম। সেখানে নিরাপদদের বাড়ি চা খেয়ে কতক্ষণ গল্প করি। নিরাপদ এক অদ্ভুত লোক। সে বলে নাকি ভূত দেখে। মাঠে-ঘাটে সর্বদাই ভূত বেড়াচ্চে সরু সুতোর মত।

আমি বললুম—বলেন কি?

—হ্যাঁ, বিভূতিবাবু। ওরা আবার তারা ধরে নামে। আমি সকালে উঠে দেখেচি বনের সব তারা পড়ে আছে। সূর্য ওঠবার আগে তারার ঝাঁক আপনিই আকাশে উঠে যায়। কেবল যেগুলো শিশিরে খুব ভিজে যায়, সেগুলো ঝোপের তলায় খুব ভোরে পড়ে থাকে। ভিজে ভারি হয়ে যায় কিনা, তাই আর উঠতে পারে না।

আমি খুব অবাক-মত মুখখানা করে নিরাপদর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ও নাকি সূর্যালোক থেকে তাপ সংগ্রহ করে দেশের কাজ করবে, সেজন্য সূর্যকে জয় করচে। রোজ মাঠে বসে সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

ঘন অন্ধকার। বড় বড় গাছের মাথায় অগণ্য নক্ষত্রদল জ্বলজ্বল করচে—কি অসীম দ্যুতিলোক পৃথিবীর চারিধার ঘিরে। টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেচে বলে একরকম অন্ধকারেই চলে আসতে হল। নিরাপদ সঙ্গে খানিকদূর এল গল্প করতে করতে—রাস্তার ধারে সাঁকোর ওপর দু-জনে কতক্ষণ বসলুম। আমি গল্প করি আর মাথার ওপর চেয়ে চেয়ে নক্ষত্র দেখি, একবার চারিধারের অন্ধকার বনানী দেখি।

আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে একটা চমৎকার সূর্যাস্ত লক্ষ্য করলুম। আর সেই বন—ঝোপের সুগন্ধ ! এ গন্ধটা আমায় এবার বড় মুগ্ধ করে রেখেচে। এদের ছেড়ে কলকাতা যাবার দিন নিকটবর্তী হয়েছে মনে ভাবলেই মনটা খারাপ না হয়ে পারে না, কিন্তু এখানে নানা কারণে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠচে না—প্রথম কথা, সঙ্গে বই নেই—আমার নোটবইগুলো নেই। এমন কি লেখবার উপযুক্ত খাতা বা কাগজপত্র পর্যন্ত বেশী আনি নি। বই ভিন্ন আমি থাকতে পারি নে। বই উপযুক্ত সংখ্যায় না আনা একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েচে এ ছুটিতে।এমন ভুল আর কখনো হবে না। দুটো ছোট গল্প লিখেচি—এবারকার পুজোতে তার বেশী কিছু হল না।

আমাদের পাড়ার সবাই কাল সকালে সাত-ভেয়ে কালীতলায় যাবে। অভিলাষের নৌকো বলে ওই পথে অমনি সইমাদের রান্নাঘরে গিয়ে বসলুম। কতকাল পরে যে ওদের রান্নাঘরে গেলাম!নলিনীদিদি যত্ন করে বসালে—চা আর খাবার দিলে, তারপর কতকালের এ-গল্প ও-গল্প, কত ছেলেবেলার কথা, নলিনীদির বিয়ের সময়কার ঘটনা। ওর

স্বামী উত্তর আফ্রিকায় ছিলেন সে সব গল্প। সোনার মেয়ে হয়েচে, কি সুন্দর টুকটুকে মেয়েটি, কি চমৎকার মুখখানি, বছর দুই বয়েস হবে। আমায় দেখে কেমন ভয় পেলে, কিছুতেই আমার কোলে আসতে চাইলে না।

টেঁপিদিদিকে দেখলুম আজ সকালে বছর পনেরো পরে। একেবারে বুড়ী হয়ে গিয়েচে। সেই ফর্সা রঙ, সুন্দর চোখমুখের আর কিছু নেই। মানুষের চেহারা এত বদলে যায় কালে! যা হোক, ষোল বছর পরে যে ওরা আবার দেশে এসেচে এই একটা বড় আনন্দের বিষয়।

আমাদের গ্রামের প্রকৃতি অদ্ভুত, কিন্তু মানুষগুলো বড় খারাপ। পরস্পর ঝগড়া-দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, পারিবারিক কলহ, জ্ঞাতিবিরোধ, সন্দেহ, কুসংস্কার—এতে একেবারে ডুবে আছে। লেখাপড়া ও সৎচর্চার বালাই নেই কারো। AEschylus-এর কথায়:

"They live like silly ants

In hollow caves unsunned;

To them comes no sun, no moon,

No Stars, music, no spring

Flower perfume...."

আজ সকালে আমরা নৌকোয় সাত-ভেয়ে কালীতলায় গেলাম। পথে চাল্‌তেপোতার বাঁকে কত রকমের ফুল যে ফুটেচে—সেই আর বছরের কুঁচো কুঁচো হল্‌দে ফুলগুলি, নীল ঘাসের একরকম ফুল, কলমীর ফুল—সকলের চেয়ে বেশী ফুটেচে তিৎপল্লার ফুল—যে ঝোপের মাথা দেখি, সর্বত্র আলো করে রয়েচে ওই ফুলে। বেলা একটার সময় কালীতলায় গিয়ে পৌঁছনো গেল। তারপর আমরা গেলুম রেলের পুলে বেড়াতে। বটতলায় রান্না করে খাওয়া হল। ক্ষুদু ছুটে গেল আমাদের সঙ্গে রেলের রাস্তায়। আমরা পুরোনো বনগাঁয়ের দিকে যাচ্চি—রামপদ সাইকেল নিয়ে এসে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল। খাবার পরে আবার একটু রেল লাইনে বেড়িয়ে সন্ধ্যার সময় নৌকোয় উঠে নৌকো ছাড়ি। পথে কত কি গল্প করতে করতে চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রির মায়া যেন আমাদের পেয়ে বসল। যখন চালতেপোতার বাঁকে এসেচি, তখন নিস্তব্ধ নির্জন সুগন্ধ বনের চরে কাটা চাঁদের শিশির-পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ও নক্ষত্রলোকের শোভা যেন সমস্ত নদী ও বনকে মায়াময় করেচে মনে হল। চাঁদডোবা অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ঘাটে এসে নৌকো লাগল।

তবুও মনে হয় এসব জায়গায় বারো মাস আসা আমাদের মত লোকের চলে না। কারণ জীবননদীর স্রোতধারা এখানে মন্দগতিতে প্রবহমান—সক্রিয়, উন্নতিশীল, বেগবান জীবন এখানে অজ্ঞাত। বদ্ধ জলে পানা-শেওলা জমে, জলকে শীঘ্র দূষিত করে ফেলে। সে চায় জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করতে, যাকে তার উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতা দিয়ে ভগবান সৃষ্টি করেচেন, যাকে dull, bore এবং stupid করে সৃষ্টি করেন নি, যার জীবনের পুঁজি অনেক বেশী, তার জন্যে এসব জায়গা নয়। কিছুকাল এসে বেশ কাটানো যায় বা আসাও উচিত। কিন্তু চিরদিন এখানে যে কাটাবে তাকে তাহলে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সেবাব্রতে দীক্ষিত হতে হবে, যে বলবে, আমার নিজের কিছু চাই নে, দেশের ছেলেদের জন্যেস্কুল খুলব, তাদের পড়াব, দরিদ্রদের দুঃখ মোচন করব, ম্যালেরিয়া তাড়াব ইত্যাদি—সে রকম মানুষ হাসিমুখে সমস্ত অসুবিধা ও অন্ধকারকে বরণ করে নিয়ে এখানে এসে চিরকাল বাস করতে পারে।

আজ শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে একবার বাইরে এলুম, মনে হল খুব মৃদু জ্যোৎস্নালোক ঘরের দাওয়ায়—চাঁদ তো অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েচে তবে এখন কিসের জ্যোৎস্না? ক্ষীণ হলেও এটা জ্যোৎস্নালোক সে বিষয়ে কোন ভুল নেই, কারণ খুঁটির ছায়া পড়েচে, বেড়ার কঞ্চির ছায়া পড়েচে, আমার নিজের ছায়া পড়েচে। দূর আকাশে এক সময় হঠাৎ

নজর পড়ল—দেখি সঁইতে তারা উঠেচে। শুক্র-জ্যোৎস্না এত স্পষ্ট কখনও দেখি নি জীবনে—সত্যি কথা বলতে কি, স্পষ্টই কি বা অস্পষ্টই কি—শুক্র-জ্যোৎস্নাই দেখি নি কখনো। এমন অবাক হয়ে গেলুম, এত কথা মনে আসতে লাগল যে ঘুম আর হল না। আমার মন পৃথিবীর গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যোমপথে গেল উড়ে—আমি যে গ্রহলোকের জীব, আমার বাসস্থান যে বিশাল শূন্যের মধ্যে, অন্য আরও গ্রহ ও অগণ্য তারাদলের মধ্যে, কত কোটি সূর্য সেখানে দীপ্যমান, কত নীহারিকাপুঞ্জ, কত দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তি, বিদ্যুৎ, কসমিক রে,—এদের সঙ্গে আমার আত্মা যেন এক হয়ে গেল। আমার অর্থলিপ্সু বৈষয়িক আত্মা মুক্তিলাভ করলে অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে, ওই শুক্র-তারার আলোর পথ বেয়ে উড়ে চলে গেল অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

কাল এখান থেকে চলে যাব। তাই যেন সব কিছুর ওপর মায়া হচ্চে। ছায়াঘন অপরাহ্ণে আমাদের পোড়ো ভিটের পেছনকার বাঁশবনে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় খানিকটা চুপ করে বসে রইলুম। রাঙা রোদ পড়েচে ওদিকের একটা বাঁশঝাড়েরগায়ে। সেই রাঙা রোদ মাখানো বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে সমস্ত জীবনের গভীর রহস্যের অনুভূতি যেন মনে এসে জমল। কতকাল আগে এমন কার্তিক মাসের দিনে মামার বাড়ি থেকে বাবার সঙ্গে এসে প্রথম এ গাঁয়ে উঠেছিলুম আমার বাল্যকালে। চুপ করে ভাবলে সে দিনের হেমন্তদিনের কটুতিক্ত বনলতা ফুলের গন্ধভরা দিনগুলির স্মৃতি আজও আমার মনে আসে—কেমন একটা মধুর, উদাস ভাব নিয়ে আসে ওরা। তারপর কত পথ চলেচি, কখনও কণ্টকাকীর্ণ আরণ্যপথ বেয়ে, কখনও রৌদ্রদগ্ধ মরুবালুর বুক চিরে, কখনও কোকিল-কূজিত পুষ্পসুরভিত কুঞ্জবনের মধ্যে দিয়ে চলেচি....চলেচি...কত সঙ্গী-সাথীর হাসি-অশ্রুভরা নিবেদন আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হল, কাউকে পেলাম চিরজীবনের মত, কাউকে হারালুম দু-দিনেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যই দেখলুম জীবনের সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য। সুখ দুঃখ দু-দিনের—তাদের স্মৃতি চিরদিনের, তারাই থাকে। তারাই গভীরতার ও সার্থকতার পাথেয় আনে জীবনে। আজ সেই শুকনো বাঁশের খোলা বিছানো, পাখি-ডাকা, রাঙা রোদমাখানো বাঁশবনের ছায়ায় বসে সেই কথাই মনে হল। সেই বাঁশের শুকনো খোলা! মামারবাড়ি থেকে প্রথম যেদিন এ গ্রামে আসি তখন দুপুরে আমাদের বাড়ির দরজার সামনে ধুলোর ওপর যে বাঁশের খোলা নিয়ে রাজলক্ষ্মী ও পটেশ্বরীকে খেলা করতে দেখেছিলুম ত্রিশ বছর আগে, আজ কোথায় তারা?

ইছামতীর ওপর নৌকো বেয়ে চলেচি। বেলা গিয়েচে। দু-ধারের অপূর্ব বনঝোপে রাঙা রোদ পড়েচে। কত কি ফুলের সুগন্ধ। কিন্তু চালতেপোতার ডানধারে যে সাঁইবাবলার নিভৃত পাখি-ডাকা বন ছিল, মনি গাঁয়ের নতুন কাপালীরা এসে সব নষ্ট করে কেটে পুড়িয়ে ফেলে পটল চাষ করেচে। আমার যে কি কষ্ট হল! পুত্রশোকের মত কষ্ট। কত তিৎপল্লার ফুল ফুটে থাকত, বন-কলমীর বেগুনী ফুল ফুটে থাকত—আর বছরও দেখেচি। কত কচি কচি জলজ ঘাসের বন, তার মাথায় নীল ফুল—এবার ডান ধার এরা সাফ্ করে ফেলেচে। আমার নৌকোর মাঝি সীতানাথ বলচে—'দা-ঠাকুর, বড্ড পটল হবে, চারখানা পটলে একখানা গেরস্তের তরকারি হবে। আমার জ্ঞানে কখনও এখানে কেউ আবাদ করে নি।' কুলঝুটির ফুলআর বনশিমের ফুল এবার অজস্র। এই দস্যি কাপালীরা, Destroyers of Beauty, কোথা থেকে এসে যে জুটল, ইছামতীর পাড়ের রূপ এরা কি নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট করে ফেলচে।

রোদ একেবারে সিঁদুরে হয়ে বাঁশঝাড়ের মাথায় উঠেচে। অপরাহ্ণের বাতাস নানা অজ্ঞাত বনফুলের মিষ্ট গন্ধে ভারাক্রান্ত। নদীপথে বিকেলে ভ্রমণের মত আনন্দ আর কিসে আছে? কি গভীর শান্তি, কি বন-শোভা, কি অস্ত-আকাশের মায়া।

ছুটির দিন। কলকাতা ভাল লাগচে না। এই ক-দিনেই কলকাতা যেন বিস্বাদ হয়ে গিয়েচে। আজ বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে থ্যাকারের দোকানে গিয়ে একখানা বই পড়ছিলুম কার্জন পার্কের সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে মাঠে একটা জায়গায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। একটা বেঞ্চে বসে আছি, দেখি ডাঃ পি. সি. রায়

সামনে দিয়ে যাচ্চেন। দু-জনে গল্প করতে করতে বেড়ালুম অনেকদূর পর্যন্ত। উনি বেশির ভাগ বললেন ‘প্রবাসী’র কথা। যোগেশ বাগল ‘প্রবাসী’ ছেড়ে গিয়েচে সেজন্যে দুঃখ করলেন। গিরিশবাবু*[3] দেখি বিছানা পেতে লর্ড রবার্টসের প্রতিমূর্তির পাদপীঠে বসে আছেন। আমরাও গিয়ে জুটলাম। আজ রাত্রে মাদ্রাজ মেলে ডাঃ রায় বাঙ্গালোর যাবেন, সে কথা হচ্ছিল। তাঁর গাড়িতে ফিরে এলাম। Nineteenth Century Review থেকে ক’টা ভালো ভালো কবিতা তুলেচি:—

Beyond the East Sunrise, beyond the West the sea,
And East and West wander-thirst that will not let me be.
And come I may, but go I must, if men ask you why.
You may put the blame on the stars and the sun, on the white cloudand the sky.
‘To scorn all strife and to view all life
With the curious eyes of a child.'
‘To travel hopefully is better than to arrive.’
‘To love Nature for the sake of what it brings forth, for its beauty, for its harmony will help a little nearer to perfection’.
‘To feel love for humanity in the sweetness of spritual communion, in the joy of helping one another, in the happiness of playing a part together in the everlasting Work of the farm of world and universe, will bring you all the nearer to the goal of evolution.

আজ আশুতোষ হলে জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির বক্তৃতা শুনতে গেলুম। চিত্রকর হিরোসিকের কতকগুলো ছবি, প্রধানত ল্যান্ডস্কেপ, বড় ভাল লাগল—বিশেষত অর্ধচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র, নানারকমের চাঁদের রূপ। প্রধানত পল্লীদৃশ্য, ঝরনা, বাঁশঝাড়, গ্রাম্য নদী ইত্যাদি। হকুসাই ও হিরোসিকে এ দু-জনের শক্তিই এ বিষয়ে খুব অসাধারণ বলে মনে হয়েচে আমার। নোগুচির বক্তৃতাও বেশ সুন্দর—সকলের চেয়ে আমার ভাল লাগল ঐ কথাটা—‘In the twilight, when the vision awakes'; আমি তো আমার জীবনে কতবার এটা দেখেচি বলেই আমার কথাটা বড় মনে ধরেচে। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক ভালো কথাই যে বোঝা যায় না, আমাদের দেশের অনেক Self-styled সমালোচক সেই সব বোঝেন নাসেদিন বাঁশবাগানে রাঙা রোদ পড়ে যে দৃশ্যটার সৃষ্টি করেছিল, আজ পনেরো-ষোল দিন হয়ে গেল এখনও এই নোগুচির বক্তৃতা শুনতে শুনতে সেই কথাটা মনে হল। সে আনন্দ মনের গোপন মন্দিরে এখনও সেই রকম সতেজ ও নবীন আছে। এই দৃশ্যটা মনে এলেই আনন্দটাও আসে সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতিকে দেখবার চোখ না খুললে মানুষের জীবনে সত্যিকার আনন্দ নেই, একথা কতবার বলেচি আমার নানা লেখার মধ্যে—কিন্তু আমাদের দেশের লোকে সব এক জোটে চোখ বন্ধ করে আছে। চোখ খোলায় সাধ্য কার? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও হার মেনে গিয়েচেন। অনুর্বর মরুবালুতে বীজ বপন করে ফল পাওয়ার আশা তো আকাশ-কুসুম হতে বাধ্য।

আজ রবিবার দিনটা দমদমার ওপারে একটা বাজে বাগানবাড়িতে গিয়ে নষ্ট হল। আমার এ ধরনের Outing মোটে পছন্দ হয় না—কি করি, দলে পড়ে যেতে হল—বিশেষ করে মহিলাদের কথা ঠেলতে পারা যায় না; কিন্তু একটা কপির ক্ষেতের সামনে বসে শতরঞ্জি বিছিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে সদলবলে চা খাওয়ায় যে কি আনন্দ আছে, আমি তা বুঝলুম না। আর কি মশা! কলকাতার উপকণ্ঠে এই শীতকালে যেমন ভয়ঙ্কর মশার উপদ্রব,

[3]গিরিশবাবু—বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালেও এর সিকি নেই। অথচ শহরের লোকে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে শহরের উপকণ্ঠে এই ধরনের সাজানো-গোছানো বাগানবাড়ি করে —মাঝে মাঝে সেখানে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হল্লা হবে, এই সব insipid ধরনের Outing-এর সংসর্গ আমায় ছাড়তে হবে এবার।

সার অলিভার লজের পত্রাবলীর মধ্যে সেদিন পড়লুম এই বিশাল বিশ্বের আকৃতি, গঠন—প্রসারতা (Structure and extent of the Universe) তাঁকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে—তাই এক জায়গায় তিনি বলেচেন দেখলুম—'Universe is the body of Go—this is one of His modes of manifestations.' তাঁর রচিত বিশ্বের আকাশ, নক্ষত্র, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মানুষ, জীবজন্তু—সব মিলেই তিনি। তিনি এই ভাবে পদার্থের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করচেন। তাই উপনিষদ বলেচে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্। একই আছে, দ্বিতীয় আর কিছু নেই। ঈশোপনিষদের—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'।

আজ সন্ধ্যায় দমদমার বাগানবাড়ি থেকে ফিরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নক্ষত্র-জগতের পানে চেয়ে চেয়ে ঐ সব কথাই মনে হচ্ছিল। সেদিনকার সেই গানটা—'The home I was born.'আমার কানে এখনও যেন বাজচে—তা থেকেই কথাটা মনে এল। এ রকম যে কতবার হয়েছে! একটা অনুভূতি পেলে মন শীঘ্র চলে যায় আর এক শ্রেণীর অনুভূতিতে।

শুক্রবার বিকেলে বনগাঁয়ে গেলাম। সেখানে নেমে বাসায় গিয়েই খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলুম। তখন চাঁদ উঠেচে—মাটির সোঁদা সোঁদা সুগন্ধ ভুরভুর করচে বাগানে। কেলেকোঁড়ার ফুল এখনও আছে বটে, সুগন্ধ নেই।

দু-দিন বনগাঁয়ে থেকে আজ বিকেলের ট্রেনে এলুম কলকাতায়—জাপানী কবি নোগুচিকে P.E.N.-এর পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। প্রথমেই হোটেলের হলে ঢুকে দেখি তখনও সবাই আসে নি, কেবল মণীন্দ্র বসু ও দু-পাঁচজন এখানে ওখানে আছে। কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে গালুডি ও ঘাটশিলা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলচি, এমন সময়ে পবিত্র এসে বললে, তোমাকে ডাকচে নলিনী পণ্ডিত, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে কে একজন তোমার সম্পর্কে পত্র লিখেচে সেজন্যে।

বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, মণীন্দ্র এসে টেনে নিয়ে গেল। তারপর সবাই টেবিলে যে যার বসে গেল। সুরমা বসু ও ক্ষীরোদের স্ত্রী, আমি এবং নির্মল বসু এক টেবিলে। চা পরিবেশনহওয়ার পরে স্যান্ডউইচ চলেচে সেই সময় নোগুচি এলেন। কালিদাস নাগ নিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী কবি-সম্মেলন থেকে। রামানন্দবাবু উঠে তাঁর ষষ্ঠিতম জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনন্দন জানালেন। নরেন দেব আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন চারু রায়ের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত করতে। চারু রায় কেন যে সাহেবী পোশাক পরে এসেচেন, এ আমি বুঝতে অক্ষম, যেখানে নোগুচি নিজে এসেচেন জাপানী পোশাকে। তারপর নোগুচি নিজের জাপানী কবিতা পাঠ করলেন এবং তারপর ইংরেজী অনুবাদ পড়লেন। কালিদাস নাগ আন্তর্জাতিক P.E.N.-এর সভাপতি H.G. Wells-এর একখানা চিঠি পড়লেন—আমাদের বঙ্গীয় P.E.N.-এর প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র। জাপানী কনসাল-জেনারেল কিছু বললেন, কিন্তু তা কেউ বুঝতে পারলে না। যখন এ পর্যন্ত হয়েচে—তখন চপলা দেবীর ভাই ফণী চক্রবর্তী এসে আমাদের টেবিলে বসল। সুরমা বসু তাকে চা করে দিলেন। ফণীর সঙ্গে মণীন্দ্র বসু আমার আলাপ করিয়ে দিতে যাচ্ছিল—ফণী হেসে বললে অনেক কালের আলাপ আছে, আলাপ করিয়ে দিতে হবে না। তারপর জাপানী সাহিত্য সম্বন্ধে সে কিছু কিছু নিজের মত জানালে, বিশেষত নোগুচির কবিতা সম্বন্ধে। আমি, নির্মলবাবু ও ফণী তিনজনেই তখন মজে গিয়েচি। সুরমা বসুকে ইয়োরোপীয় সঙ্গীত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলুম। কারণ তিনি মিউনিকে বেহালা শিখতেগিয়েছিলেন এবং জার্মান ক্লাসিক্যাল মিউজিক সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন। ক্ষীরোদের স্ত্রীও বেশ মেয়ে।

নোগুচি জাপানী কবিতা পড়লেন, রামানন্দবাবু সামান্য কিছু বক্তৃতা করলেন তারপর আমরা মীরা গুপ্তের দলে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে নীরদবাবু ও সোমনাথবাবুর সঙ্গে মোটরে ময়রা স্ট্রীটে এলুম। ওঁরা একটু পরে গেলেন Regal-এ A mid-summer Nights Dream দেখতে। আমি বাড়ি চলে এলুম।

আজ সুধীরবাবুদের বইয়ের দোকান থেকে বার হয়ে গোলদীঘিতে গিয়ে যখন বসেচি, তখন রাত সাতটা। ধোঁয়া এত বেশী যে আকাশে সপ্তমীর চাঁদকে ঢেকে ফেলেচে;ট্রামের আলো, বাড়ির আলো, রাস্তার আলো ধোঁয়ার জালের মধ্যে মিটমিট করচে। মনে পড়ল ১৯১৪ সালের এমন দিনের কথা। আজ একুশ বছর আগেকার ব্যাপার। আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, সবে কলকাতায় এসেচি—এই রকম ধোঁয়া দেখে মন তখন দমে যেত।নতুন এসেচি গাছপালা ও ইছামতী নদীর সংসর্গ ছেড়ে। তারপর কতদিন কেটে গেল—কত বিপদ, আনন্দ, দুঃখ ও আশার মধ্য দিয়ে। তখন আমরা সবাই তরুণ। The world was very young then—মামাদের তখনও বিয়ে হয় নি। এই বৈশাখে ছোট মামার বিয়ে হল। এখন মন পরিণত হয়েচে—কত ভুল শুধরে নিতে পেরেচি, অপরের মত সহ্য করবার ক্ষমতা অভ্যাস করেচি—আমার মনে হয় জীবনের এই জিনিসটাই সব চেয়ে বড়। Intolerence-এর চেয়ে বড় শত্রু জীবনের আর কিছু নেই। ইউনিভার্সিটির আলোগুলোর দিকে চেয়ে সেই সব দিনের কথাই মনে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও পেলুম খুব। জীবনে একটা গভীরতার দিক আছে, সেটা সব সময় আমাদের চোখে পড়ে না—এই রকম নির্জনে বসে না ভাবলে।

কাল মতিলাল ও আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে কার্জন পার্কে অনেকক্ষণ বেড়ালুম ও গল্প করলুম। মতিলাল আমার ক্লাসফ্রেন্ড, ও কলেজ থেকে বার হয়ে কিন্তু বিবাহ বা চাকরি করলে না, পৈতৃক কিছু টাকা আশ্রয় করে আজ ষোল বছর ধরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পড়চে—জানবার জন্যে যে, মানুষের আত্মা সত্যিই অমর কিনা।

ও বললে, মা মারা যাওয়ার পরে এ প্রশ্ন আমার মনে জাগে—তারপর ঢুকলুমইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, নিজেও অনেক বই কিনেচি।

বললুম—কি সিদ্ধান্তে উপনীত হলে ?

ও বললে—মানুষের আত্মা অমর। আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।

—তা তো হল, কিন্তু জীবনটাকে দ্যাখো এইবার। পড়াশুনো করেই জীবন কাটালে। এবার সংসার কর। জীবনের অভিজ্ঞতা কোথায় তোমার?

মতিলাল বললে—এবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ছাড়বো। একখানা বই লিখচি এ বিষয়ে। সেখানা শেষ হতে আর বেশী দেরি নেই। এবার ছাড়বো।

তারপর ওখান থেকে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে দেখি শেরিফ বড়লাটকে যে গার্ডেন—পার্টি দিচ্ছে সেই উপলক্ষে বাগানে চমৎকার আলো দিয়ে সাজিয়েচে—গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠচে যখন ঝিলের ধারে ফুটন্ত ফুলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওখান থেকে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা ক্লাবের সাদা বেঞ্চির ওপর বসলুম—সামনেই পূর্ণিমার চাঁদ। স্থানটা নির্জন—কেবল আধজ্যোৎস্না অন্ধকারের মধ্যে একজন অশ্বারোহী পুলিশ এল, গেল। আধঘণ্টা পরে লর্ড রবার্টস-এর প্রতিমূর্তির পাদপীঠে গিয়ে দেখি শুধু গিরিশ বোস এসে শুয়ে আছেন, ডাঃ রায়ের[4] চাদর পাতা, কিন্তু তিনি বালিগঞ্জে গিয়েচেন এখনও আসেন নি। তাঁর আসতে একটু দেরিই হল। সোয়েন হেডিনের তাকলামাকান মরুভূমি পার হওয়ার গল্প করলুম—ওঁরা খুব মন দিয়ে শুনলেন।

সকালে বীরেশ্বরবাবু এলেন। তারপর বালিগঞ্জে অন্নদা দত্তের বাসায় গেলাম, দুপুরে নিমন্ত্রণ ছিল। অন্নদাবাবুর শরীর খুব খারাপ—পূর্বে দেশের জন্যে খুব করেচেন—এখন কেউ মানে না, পোঁছে না—অথচ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলের জন্যে উনি কি ভয়ানক পরিশ্রমই না করেচেন। আমি সব জানি। ১৯২২-২৩ সালের কাউন্সিলে উনি চট্টগ্রামের প্রথম M.L.C. ছিলেন। আমি ওঁর কাগজপত্র আমাদের League office থেকে টাইপ করে এনে দিতুম।

---

[4]আচার্য প্রফুল্ল রায়।

অন্নদাবাবুর মেয়ে মণির সঙ্গে পনেরো বছর পরে দেখা। ওর ভাল নাম যে মণিকুন্তলা তা আমি আজ এত কাল পরে ওঁর মুখে শুনলুম। মণি তখন ছোট মেয়ে ছিল,আমি যখন ১৯২২ সালে অন্নদাবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলুম চট্টগ্রামে। আমার মুখে গল্প শুনতে ও ভালবাসত। মণি যে বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক ও আই-এ পাস করেছিল—সে সব খবর আমি আজই প্রথম জানলুম। ওর ছোট একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে রইলুম-বেশ চার মাসের ছোট্ট খুকীটি। পৃথিবী অদ্ভুত। কে ভেবেছিল যে আজ এত বছর পরে মণির সঙ্গে বালিগঞ্জে এভাবে আবার দেখাশোনা হবে! মণির মুখে শুনলুম সুপ্রভা মণিদের নিচে পড়ত এবং দু—জনে একসঙ্গে দেশে যেত।

ওখান থেকে বার হয়ে আমি আর বেগুন এলুম মণীন্দ্র বসুর বাড়ি। সেখান থেকে সুরমা বসুর বাড়ি, রামমোহন রায় রোডে। বেশ সাজানো বাড়ি, সাজানো ড্রয়িং রুম। সুরমা বসু ও তাঁর একটি বোন গান গাইলেন বড় চমৎকার। মেয়েটি মিউনিকে ছিলেন, ইউরোপীয়ান মিউজিক শিখতেন।

দেখে মনে হল এই সব মেয়ে, মণি, সুরমা বসু কেমন চমৎকার ঘর বর পেয়েচে, বেশ আছে। কিন্তু যার আরও বেশী ভালভাবে এসব জিনিস পাওয়া উচিত ছিল সে কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছে, তার কিছুই হল না। জীবনে এমন ট্র্যাজেডি কতই যে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অথচ সে কি বুদ্ধিতে, কি বিদ্যায় কোন অংশে এদের চেয়ে কম তো নয়ই—বরং অনেক বেশী। ভেবে সত্যিই বড় কষ্ট হয়।

সুরমা বসুর সুন্দর গান শুনবার সময়ে আরও মনে হল পল্লীগ্রামের সেই সব অভাগিনী মেয়েদের কথা, যারা জীবনে কোন সুখই কোনদিন পেল না। এমন কত আছে, জীবনে তাদেরসঙ্গে কত ভাবে কত পরিচয়। আজ সন্ধ্যায় তাদের সবারই করুণ মুখ মনে পড়ে আনন্দের পরিবর্তে গভীর দুঃখ ও সহানুভূতিতে মন ভরে উঠল।

আজ সাতভেয়ে-তলায় আমাদের বনভোজন গেল। বনগাঁয়ের আমাদের বন্ধুবান্ধব উকীল মোক্তার সকলেই ছিল, তা ছাড়া সাবরেজিস্ট্রার ও ডাক্তার। বেলা দশটার সময়ে নৌকো করে আমরা গান করতে করতে নদীপথে চলেচি—পুরনো বনগাঁ ও শিমুলতলার সবাই ভাবছে এ আবার বাবুদের কি খেয়াল! তারপর বটতলায় গিয়ে মাদুর পেতে বসে আমরা সবাই খুব গল্পগুজব করলুম। আমরা ধূমপান করতে পারি নি, কারণ প্রবীণের দল সর্বদা কাছে কাছে রয়েচে। সতীশ মামাকে অনেক কৌশল করে সরিয়ে একটু আমাদের সুবিধে করে নেওয়া গেল। এর আগেও গত পুজোর ছুটিতে একদিন সাতভেয়ে-তলায় এসে খুদ, খুড়ীমা, ন-দি— আমরা সবাই বনভোজন করে খেয়েছিলাম। এত বড় বটগাছ এখানে আর কোথাও নেই—এক রাজনগরের বট ছাড়া। নদীর দু-ধারে এড়ঞ্চির ফুল ফুটে আছে—কিন্তু কুঠীর সে শোভা নেই এখানে। রামায়ণের সেই শ্লোকটা মনে পড়ল।

সন্তি নদ্যো দণ্ডকে তথা পঞ্চবটী বনে।

সরযূ-বিচ্ছেদ-শোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ।।

পঞ্চবটী ও দণ্ডকারণ্যে তো কত নদনদী বর্তমান, কিন্তু সরযূ-বিরহ-দুঃখ কি রামচন্দ্র সহ্য করতে পারেন?

আমারা মনে হয় বারাকপুরের ওদিকের বনশোভা নেই এই অঞ্চলে। মাঠে এদিকে চাষ অত্যন্ত বেশী, পোড়ো জমি কোথায় যে যদৃচ্ছাবিস্তৃত বনভূমি গড়ে উঠবে? আরণ্য-প্রকৃতি এখানে মানুষের সংস্পর্শে এসে ভীতা, সঙ্কুচিতা—তার সে উদ্দাম স্বাধীনতা নেই।

রান্না শেষ হবার কিছু আগে আমরা নদীর ধারে রৌদ্রে বসে তেল মেখে সাঁতার দিয়ে স্নান করলুম। আমি তো তেল মাখলুম বোধ হয় তিন বৎসর পরে। সাঁতার দেবার সময়ে খুব আনন্দ হল। ওপারে কচি মটরের ক্ষেতে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেচে—এই দলের মধ্যে গাছপালা ভালবাসে দেখলাম কেবল একমাত্র সাবরেজিস্ট্রার। আর কারো সেদিকে খেয়ালনেই।

বেলা তিনটের সময় আমরা সবাই খেতে বসলুম। নিশিবাবু ও সুরেনবাবু পরিবেশন করলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ করে খাওয়া হয়ে গেল কিছু বেশী। সন্ধ্যার সময় সেই ঝোঁকে আমরা গল্প করতে করতে ফিরলুম।

সন্ধ্যার সময় যতীন ডাক্তারের দোকানে। আমার বাল্যবন্ধু নিতাই পড়ুইয়ের সঙ্গে যতীনদার দোকানের অংশ নিয়ে খুব ঝগড়া হল। নিতাই নিজের জিনিসপত্র, লোপ বালিশ, দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ছোট ছেলের হাত ধরে অন্ধকার রাত্রে বাড়ি চলে গেল। যতীনদা ওর প্রাপ্য টাকা দিলে না, আরও বললে, তুমি দোকানের তালের মিছরি খেয়েচ, তোমার ছেলে দুধ খেয়েচে,—টাকা আমার যখন খুশি হবে তখন দেব। কার যে দোষ তা দু-পক্ষের কেউই বুঝতে দিলে না—এ বলে ওর দোষ, ও বলে এর দোষ। বাঙ্গালীর ব্যবসায় এই রকম করেই নষ্ট হয়ে যায়।

র‍্যাস্কোর পল্ ভারলেনের জীবনী পড়ছিলুম। নিচের লাইন ক'টি বড় চমৎকার!

Et je m'en vais And I going

Au vent mauvais Born by blowing Qui m'emporte Wind and grief
Dec'a, del'a, Flutter here and there Pareil'a la As on the air

Feuille morte. The dying leaf.

শেষের ছত্র কয়টির ছন্দ ও সুর এত মধুর যে বার বার পড়লেও তৃপ্তি হয় না। ওর প্রথম দুটো stanzas

Le sanglots longs Longsobbing wind

Des violons The violins of a autumndrove

De l'automme Wounding my heart Blessent mon

Coeur With languor as smart D'une langueur In monotone

Monotone Choking and hale

Tout suffocant When on the gale

Et bleme, quand The hours sound deep Sonne l'heure, I call to mind

Je me souviens Dead year behind

Des jours anciens And I weep

Et je pleure.

Verlain-এর বিষয়ে এ কথাটা ঠিকই মনে হয় যে, লেখক বর্তমান যুগের লোককে মজাতে পারলে সে কোন যুগের লোককেই মজাতে পারবে না। Bernerd Shaw তাঁর Sanity of Art-এ যে কথা লিখেচেন, ভারি সত্য।

The writer who aims at producing the platitudes which are 'not for this age but for all time' has his reward in being unreadable in all ages. Whilst Plato and Aristophanes peopling Athens with living men and women, Shakespeare peopling with Elizabethan Mechanics and War-wickshire hunts, Carpaccio painting the life of St. Ursula exactly as if she were a lady living in the street next to him, are still alive and at home everywhere among the dust and ashes of thousands of academic, punctilious, archaeologically correct men of letters and art.

Montaign সম্বন্ধে একটি কথা বড় ভাল লাগলো। 'He was the greatest artist of all—he knew the art of living'.

অনেকদিন আগে ঠিক এই দিনে আজমাবাদ কাছারি থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে কলবলিয়া পার হয়ে কাটারিয়া পুলের ওপরে সূর্যাস্ত দেখেছিলুম। মেসে বসে আজ ডালহাউসি স্কোয়ার ঘুরে বেরিয়ে এসে সে কথা মনে পড়ল ডায়েরী দেখে। কি উন্মুক্ত জীবনের পরে কি বদ্ধ জীবন যাপন করেচি এখানে! ঠিক সেই বিকেলেই আজ বইয়ের গুদামে বসেছিলুম!

আজ সারাদিনটা অত্যন্ত ঘোরা হয়েচে, বেলা সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত। আমার মেস থেকে বেরিয়ে নীরদ চৌধুরীর বাড়িতে চা খেয়ে পশুপতিবাবুর বাড়ি গিয়ে পেনেটীর বাগান-বাড়ি যাবার কথা বলি। বন্ধুদের নতুন বাসায় যাই, তার আগে একবার নতুন পত্রিকার আপিসেও যাই। বেশি আড্ডা দিলে একটা অবসাদ আসে—শারীরিক ও মানসিক, যদিও আমি তা আজ অনুভব করি নি, তবুও আমার মনে হয় এতে কোনো আনন্দ নেই। তবে সপ্তাহে একদিন এমন বেড়ানো যেতে পারে—যদি অন্য সব কটা দিন নিজের কাজ করা যায়।

লেখাপড়া সম্বন্ধেও দিনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়া খুব খারাপ। এক বিষয়ে মনোনিবেশ অভ্যাস করতে হয়, এবং যে এক বিষয়ে মনোনিবেশ করে, সে হয়তো আরও পাঁচটা জিনিস থেকে বঞ্চিত আছে, কিন্তু সে সৃষ্টি করতে পারে।

অনেকদিন পরে পানিতর গেলুম। রাত্রে ইটিন্ডা ঘাটে নেমে একজন লোক পাওয়া গেল। সে আবার ইটিন্ডা বাজারের ডাক্তার। হাটে ভিড় ঠেলে রাত্রে পানিতর গিয়ে পৌঁছাই। উপেনবাবুর বাড়ি বেড়াতে গেলুম, বৃদ্ধ শয্যা আশ্রয় করেছেন। পুঁটীর সঙ্গে দেখা করলুম বাড়ির মধ্যে গিয়ে, ওরা জলখাবার খাওয়ালে। নরেনের বাড়িতেও আবার খাবার খেলুম। তারপর পানিতরের ওপরের ঘরে (দোতলার উপরের ঘরে) রাত্রে শুলুম। কোণে সেই খাটখানা পাতা আছে, প্রথম পানিতরে গিয়ে ঐ খাটখানাতেই আমি শুয়েছিলাম মনে আছে। ঠিক সেই পুরানো জায়গাতে খাটখানা এখনও পাতা। রাত্রে কত কথা মনে পড়ল। আজ কতদিনের কথা যেন সে সব! জাঙ্গিপাড়ার দিনের কথা, সেই অন্ধকারময় দুঃখের দিন। তখন কি ছেলেমানুষ ছিলুম আর কি নির্বোধই ছিলুম তাই এখন ভাবি। তখন বি-এ পাস করে কি না-জানি ভাবতাম নিজেকে।

আমি খেয়া পার হয়ে বাসে উঠে আস্‌চি শ্বশুরমহাশয়ের সঙ্গে পথে দেখা। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আবার বসিরহাট এলুম ওঁদের নতুন বাসায়। দিদি ও পাঁচী ওখানে আছেন। দিদিকে দেখলে চেনা যায় না এমন নয়, তবুও সে দিদি আর নেই—কি যেন নেই মুখে যা তখন ছিল। একথা বলা বড় কঠিন। বয়স হলে মানুষের মুখের কি যেন চলে যায়, এর উত্তর কে দেবে? পাঁচীকে তো চেনাই যায় না। দেড়টার গাড়িতে পাঁচীর সঙ্গে এক গাড়িতে কলকাতা এলুম।

ঠাকুরমায়ের শ্রাদ্ধের পর সেই মার্টিন লাইনের গাড়িতে বসিরহাট থেকে এসেছিলুম, তখন আমি জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকরি করি। কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম চাকরিতে ঢুকেচি। আর আজ এই সতেরো-আঠারো বছর পরে মার্টিনের গাড়িতে চড়ে বসিরহাট থেকে এলুম। সতেরো-আঠারো বছরের আগের আমি আর আজকার আমি, আমার চিন্তাধারা, অভিজ্ঞতা, জীবনের outlook সব বিষয়ে কি ভয়ানক বদলে গিয়েছে তাই ভাবচি।

দিদি তাঁর মেয়ে মানীর বিয়ের জন্যে ট্রেনে উঠবার সময় পর্যন্ত বললেন। বললেন—ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে দেখা হল না, এখানে যখন এলুম, তখন দেখা হবে তোমার সঙ্গে। কিন্তু এ কথায় তেমন আনন্দ পেলুম না। আগে হলে দিদির কথায় কত খুশি হতাম কিন্তু আজ—মানুষের মন কি বদলেই যায়! মন যে কি বহুরূপী দেবতা, কি বিচিত্র রহস্যময় তার প্রকৃতি, ভেবে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সন্ধ্যাবেলা বন্ধুর বাসায় গিয়ে চা খেয়ে একটু গল্পগুজব করলুম রাত ন'টা পর্যন্ত। আসবার সময় ১০নং রুটের বাসে অনেকদিনের অচল একটা টাকা চলে গেল। গত পুজোর সময় টাটানগরে খ্যাঁদা টাকাটা আমার নোট-ভাঙানি দিয়েছিল, কিছুতেই এতদিন চলে নি।

আজ সকাল থেকে কত ছবি চোখের সামনে এল গেল। ইটিন্ডার পথ চাঁদাকাঁটার বন ইছামতীর ধারে। বিস্তৃত ইছামতী, ইটিন্ডার ঘাটে লোকে সব বসে রোদ পোয়াচ্চে, ইন্দুবাবুর ছেলে অনাদি, নরেনের ছেলে, দিদি, দিদির মেয়ে মানী, পাঁচী। ছোট লাইনে আসবার পথে মনে পড়ল, আগে রবীন্দ্রনাথের বলাকা থেকে কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করতুম—'এবার আমায় সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়'। কবিতাটি বড় প্রিয় ছিল তখন।

কাল সারাদিন যে বসিরহাট পানিতর অঞ্চলে কাটিয়েছি, আজ যেন সে সব স্বপ্নের মত মনে হচ্চে। ইছামতীর তীরের চাঁদা-কাঁটার বনের পথে, ওই স্রোতাপসারিত কর্দমাক্ত তীরভূমির সঙ্গে প্রথম যৌবনের যে সব স্মৃতি জড়িত, তা কাল একটু একটু অস্পষ্ট মনে এল। প্রসাদকে কাল বড় ভাল লেগেচে—আর প্রসাদের বাবাকে।

আজ সকালে উঠে রমাপ্রসন্নের বাড়ি গিয়ে শুনি সে গিয়েচে আপিসে। বাসায় ফিরেইহঠাৎ গিরীনবাবু এসেচে দেখলুম। সে বললে, রাজা নাকি মারা গিয়েচেন, শুনেচেন? আমি অবিশ্যি জানতুম পঞ্চম জর্জ খুব অসুস্থ, কিন্তু এত শীঘ্র যে মারা যাবেন, তা ভাবিনি। খবরের কাগজ মেসে আসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'—তাতে মাত্র এই খবর দেখা গেল 'Kings life is peacefully drawing to a close'—একজন গিয়ে পাশের বাসা থেকে স্টেট্সম্যান দেখে এসে বললে রাজা মারা গিয়েছেন বাস্তবিকই।

স্কুলে গিয়ে তখনি ছুটি হয়ে গেল। নতুন একটি প্রকাশক আমার কাছে ঘুরছিল বই নেবার জন্যে, তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলুম শৈলজাবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে বিচিত্রা আফিসে, সেখান থেকে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর বাড়ি। রাত দশটায় বাড়ি ফিরলুম।

সম্রাট বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং গত ১৯২৮ সালে অত বড় অসুখ থেকে উঠে কাবু হয়েও পড়েছিলেন। মনে পড়ে ১৯১২ সালের কথা, যখন তার দরবার উপলক্ষে আমাদের স্কুলে ভোজ হয়েছিল, আমি তখন বনগ্রাম স্কুলের ছাত্র। সেই উপলক্ষে জীবনে প্রথম বায়োস্কোপ দেখলুম বনগ্রামে ডেপুটিবাবুর বাসার প্রাঙ্গণে। সে সব বাল্যস্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েচে—তারপর দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কেটে গেল। জীবনের পথে আমিও কতদূর অগ্রসর হয়ে এসেচি। বর্তমান প্রিন্স অফ ওয়েল্স্কে বালক দেখেচি (ফটোতে অবিশ্যি), দেখতে দেখতে তার বয়স এখন হল তেতাল্লিশ বছর।

জীবন, বছর, আয়ু হুহু করে কেটে যাচ্ছে। বিরাট স্রোতস্বতী এই রহস্যময়ী জীবনধারা, কে জানে একে? ডিসরেলী বলেছিলেন, জীবন সম্বন্ধে 'Youth is a blunder, maturity is a struggle and old age is a regret'—চমৎকার বিশ্লেষণ ও summing up; তাই সত্যি কি না কে জানে!

কাল রাজপুরে অনেকদিন পরে বেশ কাটল। বেলা পড়লে আমি ও ভোম্বল ধুনি ডাক্তারের বাড়ি বসে গল্প করে বোসপুকুরে বেড়াতে গেলুম। তখন কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, বোসপুকুরের ওপারের নারকেল গাছগুলোর কি রূপ ফুটেছে! ফিরবার পথে একটা বাঁধানো পুকুরের ধারে দু-জনে বসে গল্প করলুম। বাঁধা ঘাটটা বড় সুন্দর। এই রাস্তাটার ধার দিয়ে একবার আমি কিশোরী বসুর বাড়ি থেকে বোসপুকুরে বেড়াতে এসেছিলুম, তখন মা আছেন,—ওখানে পুকুরঘাটে একটা ছেলে এসে জুটল, সে থাইসিসে ভুগছিল বলে তার বাড়ির লোকে সর্বস্বান্ত হয়ে তাকে নৈনিতালে রেখেছিল। সে এসে বললে—এদেশে কোন কিছু ভাল বিষয়ের চর্চা নেই, এখানে বসে মন টিকচে না। তারপর আমরা গেলুম খুকীদের বাড়ি, সেখানে আহারাদির পরে খুকী পাড়ার লোকের নানা দুঃখের কাহিনী বললে : মহেন্দ্রবাবুর পনেরো বছরের নাতনীটি বিধবা হয়েচে, তার মাও বিধবা, জায়ের ছেলের গলগ্রহ, কারণ ধীরেন (ওই

ছেলেটির নাম, এক সময় ও আমার ছাত্র ছিল) বাড়ির মধ্যে একমাত্র রোজগেরে লোক। ধীরেনের মায়ের কটুক্তির জ্বালায় ওদের মা ও মেয়ের জীবন অতিষ্ঠ হয়েচে। তারপর মেয়েটি আবার অন্তঃসত্ত্বা। মা বলে মেয়েকে, তুই বিষ খেয়ে মরে যা, আমি তোকে নিয়ে কি করি! একাদশীর দিন মেয়েটার মরে যাওয়ার যোগাড় হয়। তার ওপর পেটের ছেলের টান ধরে, জলতেষ্টায় ও খিদেতে, একাদশীতে বড় কষ্ট পেয়েচে। সবাই বলেছিল জল খেতে দাও, মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও দেবী দু-জনেই বলেচে, একে তো বাড়ির দুই ছেলে (মহেন্দ্রবাবুর মেজো ও সেজো ছেলে) এর আগে মারা গিয়েচে, একাদশীতে বাড়ি বসে বিধবা জল খেলে, পাছে আরও কোন অকল্যাণ হয়! দেবী বলেচে, আমার তো ওই বাচ্চা, আমার সে সাহস হয় না। বাপু, জল খাওয়াতে হয় ও মেয়েকে নিয়ে তুমি অন্যত্র যাও।

কাজেই মেয়ের জল খাওয়া হয় না।

এরা একটা কথা ভুলে যাচ্চে—

'By day and by night year in and out, century after century, there is going out a colossal broadcast of power which gives real life to all who will enter into it. Normal function of the organism is to act as a receiving set for Life Power. Clear out hatred, malice, lust, fear and all other frictions and you will find that entirely without any other effort on your part, their will prevade your being and your life that hitherto unheard wave of spiritual power.'

আমরা আরও ভুলে যাই যে, পাপ জিনিসটাতে ভগবান রাগ করুন বা না করুন—

'Sin should be synonymous with bad rational production. A bad man is known by its poor reproduction of God's life.'

'When we began to deny ourselves for the good of others it was a highly important step in the soul's development and destined to lead on to increasing concern for others' good. Then we begin to realise God with a personal interest in our life and we decide to consider his wishes.'

আরও কথা আছে। টাকা রোজগারই তো সংসারের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের চরম সার্থকতা আসবে মনের পথ ধরে। কিন্তু সময় আসে যখন মনে হয় ভগবান জীবনের কেন্দ্র, তার কাছ থেকে সব মঙ্গল আসবে—'It is well to have a clear-cut aim. Unless we are striving to attain, our policy is drift, and drift will not bring us the lost things. The lost things have to be thought for, prayed for, worked for and the Supermost thing in earthly life is the development of soul, qualification for a spacious and satisfying activity when entering the Beyond.'

'It is the outermost or highest sphere. Life there is realised more impersonally. One's whole work and activity on that sphere would be solely for the good of others. There would be no personal bias, selfish aims or ambitions would be impossible.'

আজ বেশ একটা অভিজ্ঞতা হল। মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষে সকাল সকাল স্কুল বন্ধ হবার পরে গেলুম কার্জন পার্কে ডালিয়া ফুল ফোটা দেখতে। সেখান থেকে বেরিয়ে একবার ভাবলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি গিয়ে কিছু একটু পড়ব। সাতপাঁচ ভেবে সামনেই একখানা টালিগঞ্জের ট্রাম দেখে উঠে পড়লুম তাতে। টালিগঞ্জ ডিপোতে নেমে একটু ফাঁকা মাঠ কি পাড়াগাঁ খুঁজে নেবার জন্যে হেঁটে চলেচি, কালী ফিল্মের স্টুডিও পার হয়ে একটা খাল পেলাম। খালে খেয়া

আছে, আধপয়সা করে তার পারানি। খাল পেরিয়ে যাচ্চি। একটা লোক আমার আগে যাচ্ছিল, তার মুখে শুনলাম যে নিকটে কোন গ্রামে মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষে কি একটা মেলা হয়। সেখানে চলেচে সে। আমি তার সঙ্গ নিলুম। ভাবলুম দেখাই যাক কি রকমের মেলা। চলেচি তোচলেইছি, দিব্যি পাড়াগাঁ, বাঁশঝাড়, শিমুল গাছে রাঙা ফুল ধরেচে, ঘেঁটুবনে মুকুল দেখা দিয়েচে, সজনে ফুলের মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে, দু-একটা কোকিলও ডাকছে। ক্রমে দূর থেকে লোকজনের কলরব শোনা গেল। দু-একটা দোকান বসেছে, অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কাছে গিয়ে দেখলুম। একটা নীচু পাঁচিলে ঘেরা বাগানবাড়িমত জায়গায় অনেকগুলি মেয়ের ভিড়—প্রায় চার-পাঁচ শো মেয়ে। পুরুষ তত বেশী নয়, সবাই মহা ব্যস্ত, ইতস্তত ছুটোছুটি করচে, ছেলেমেয়ে কাঁদচে, চীৎকার করচে। বাগানবাড়িতে ঢুকে দেখি ছোট্ট একটা একতলা বাড়ির সামনের উঠোনে গাছতলায় প্রায় দু-তিনশো মেয়ে ছেলেপুলে নিয়ে শালপাতা পেতে বসে আছে। শুনলাম তারা খেতে বসেচে কিন্তু আগের দল খিচুড়ি সব খেয়ে সাবাড় করে দিয়েচে।

খিচুড়ি চড়েচে, আবার না নামলে এদের খেতে দেওয়া যাবে না। মেয়েরাই সেখানে কর্ত্রী, তারাই সবাইকে দিচ্চে থুচ্চে, আদর-আহ্বান করচে, কাউকে বা শাসন করছে। একটা ছোট ঘরের মধ্যে সবাই ভিড় করে ঠাকুর দেখতে ঢুকচে দেখে আমিও ঢুকলাম। ছোট্ট কালীপ্রতিমা, নাম সুশীলেশ্বরী। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, এখানে একজন বৃদ্ধা থাকেন, তিনিই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেচেন। একটু পরে সেই বৃদ্ধাকেও দেখলুম, সবাই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করচে আর তিনি সবাইকে মিষ্টি কথায় বলচেন—না খেয়ে যেও না যেন বাবা। একটা ইটবাঁধানো চৌবাচ্চায় খিচুড়ি ঢালা হচ্চে, পাশেই আর একটা চৌবাচ্চায় কপির তরকারি। সকাল সকাল খাবার জন্যে সবাই উমেদারী করচে—অনেক দূর যাব, মেয়েছেলে নিয়ে এসেচি, ভাড়াটে গাড়ি, প্রসাদ দিয়ে দিন।

আমাকে একটা ঘরে খাওয়াতে বসালে। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হল এখানে কি খাওয়ায় দেখে যাবো না। তাই একটি মেয়েকে বলতেই সে আমায় ঐ ঘরটায় নিয়ে একখানা পাতা করে বসিয়ে দিলে। ঘরের মধ্যে আমার বসবার আসনের কাছেই আর একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে বসে খাচ্ছে আর তার ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়েকে খিচুড়ি মুখে তুলে খাওয়াচ্চে। যে মেয়েটি আমায় পাতা করে বসিয়ে দিয়েছিল সে কোথায় চলে গেল। আর একজন আমায় পরিবেশন করলে। খিচুড়ি, চচ্চড়ি, আলুরদম, কপির তরকারি, বেগুনভাজা, চাটনি, পায়েস, দই, মুড়কি ও রসগোল্লা। তা খুব দিলে, পাতে ঘি দিলে। এটা নেবে, ওটা নেবে—জিজ্ঞেস করে খাওয়ালে। কেমন যত্ন করলে যেন বাড়ির ছেলের মত, অথচ আমাকে তারা জীবনে এই প্রথম দেখলে। মেয়েদের এই একটা গুণ, খাওয়াতে মাখাতে যত্ন করতে ওদের জুড়ি মেলে না।

খাওয়া শেষ হল, আর একটি মেয়ে আবার সাজা পান দিলে। এমন মচ্ছবের খাওয়ায় যেখানে রবাহূত অনাহূত কত আসচে যাচ্চে তার ঠিকানা নেই, এখানে কে আবার খাওয়ার পরে পান দেয়! এ আমি এই প্রথম দেখলুম।

দেখে কষ্ট হল আমি যখন খাওয়া শেষ করে বাইরে এলুম, তখন সেই অল্প বয়সের বধূটি রোয়াকের সামনে পাতা পেতে বসে আছে—তখনও তাদের কেউ খেতে দেয় নি। এদের জিনিসপত্র বেশী কিন্তু লোক কম। খাওয়ার সময়ে পরিবেশনকারিণী মেয়েরা বলাবলি কচ্ছিল— আর পারি নে বাপু! সকাল থেকে খাট্‌চি আর রাত বারোটা পর্যন্ত কত খাটি? আসচে বছর আর এখানে আসা চলবে না দেখচি।

ওখান থেকে বার হয়ে একটা বাঁশবনের মধ্যের পথ ধরে অনেকটা হেঁটে গেলুম, বেলা পড়ে এসেচে, বাঁশবনে বেশ ঘন ছায়া, এক জায়গায় সাতটা ভাঙা শিবমন্দির সারি সারি, অনেকগুলো শিমুল গাছ। ফুলে ফুলে রাঙা। বড় মাঠে বসে খানিকটা বিশ্রাম করলুম— তারপর এসে ট্রাম ধরে চৌরঙ্গির মোড়ে নামলুম। সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে হেঁটে সুধীরবাবুর দোকানে এসে ভাবলুম সরোজকে গল্পটা করব, দেখি সরোজ বেরিয়ে গিয়েচে।

কি একটা অবর্ণনীয় আনন্দ পেয়েছি আজ! অথচ কেন যে সে ধরনের আনন্দ এল, এর কোন কারণ খুঁজে পাই নে। নীরদবাবুর বাড়ি যখন বসে আছি, তখনই এটা প্রথম অনুভব করলুম, কিন্তু তখনই পশুপতিবাবু ফোন করলেন, এখুনি আসুন, ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে প্রমথ বিশীর নাটক হচ্ছে! নীরদ যেতে পারলে না, আমি মিসেস দাশগুপ্তকে নিয়ে ওদের মোটরে ইন্‌স্টিটিউটে এলুম। সেখানে পরিমল গোস্বামী, প্রমথ বিশী এবং সবাই হাজির। পরিমল বললে, আপনার দৃষ্টি-প্রদীপ পড়েচি কাল রাত্রে। বড় ভাল লেগেচে। আরও গল্পগুজব চলল। আমি গিয়ে বৌঠাকরুনের সঙ্গে দেখা করে এলুম। তারপর ওখান থেকে পার্ক সার্কাসে মণীন্দ্র বসুর বাড়িতে চা-পার্টিতে এলুম, কারণ সেখানে জ্যোৎস্নার বিবাহের কথা হবে অন্নদাশঙ্করের আত্মীয়ের সঙ্গে এবং আমিই তার ঘটক। পার্ক সার্কাসের বাসা থেকে নেমেযখন মণীন্দ্র বসুর বাড়ি যাচ্ছি, তখন ছিন্নভিন্ন বাদলা মেঘের অন্তরালে প্রতিপদের চাঁদ উঠেচে, সে যে কি এক সৌন্দর্যভরা ছবি, না দেখলে বোঝানো যাবে না। তখনই আমার বিহারের জঙ্গলের ও তার হতভাগ্য দরিদ্র নরনারীদের কথা কি জানি হঠাৎ মনে পড়ল, তাদের মধ্যে ছ-বছর থেকেচি, তাদের সব অবস্থাতে দেখেছি, জানি। আর সেই নির্জন বনানী!

রাত্রে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না উঠেচে যখন বিছানাতে এসে শুই;মণীন্দ্রবাবুর বাড়িতে চারু রায়, সুরেন্দ্র মৈত্র এঁদের সঙ্গে spiritualism নিয়ে ঘোর বাদানুবাদ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। তারপর হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি ও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে আর এক পালা বাদানুবাদ।

আজ ট্রামে স্কুল থেকে গেলাম গঙ্গার ধারে। গিরিজাপ্রসন্ন সেনের কবিরাজি ডিস্‌পেন্‌স্‌রির মধ্যে অয়েল-পেন্টিংখানা ঠিক সেই জায়গাটিতে আছে—বাবার সঙ্গে কতবার ভগবতীপ্রসন্ন কবিরাজের কাছে আসতুম। বাড়িটা সেইরকমই আছে, তবে খুব পুরোনো হয়ে পড়েচে। ভাবলুম আজ এই যে এই ঘরে ঢুকলুম, জীবনে যা কিছু সব হয়েচে, সেবার এই ঘর থেকে বার হবার ও এবার পুনরায় ঢুকবার মধ্যে, সেই যে ছেলেবেলায় কিশোর কাকা সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়তেন তাও...যুগল কাকাদের ঢেঁকশেলে আমি, ভরত, নেড়া, বাদলার দিনে খেলা করতাম তাও, বাবার সঙ্গে আমি হুঁকোর দোকানে বসে লুচি খেয়েছিলুম তাও, প্রথম যেদিন ধানবনের মধ্যে দিয়ে স্কুলে ভর্তি হতে যাই বনগাঁয়ে তাও, সব কিছু—সব কিছু, কত কথা মনে হল, সারা জীবনটা যেন এক চমকে দেখতে পেলুম গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বড়অয়েল পেন্টিংটার সামনে বসে।

তারপর গিরিজাবাবুর সঙ্গে ওঁদের বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। কত পুরোনো আমলের ছবি টাঙানো, যে সব ছবি আর এখন মেলে না। উঠোনের সেই জায়গাটি যেখানে বসে বাল্যে একদিন মধুছন্দার অভিনয় দেখেছিলুম ভূষণ দাসের যাত্রার দলের, সব সেই রকমই আছে তবে যেন বড় পুরোনো হয়ে গিয়েচে।

বারাকপুরে শৈশবে যাপিত কত রাঙা সন্ধ্যা, পাখির ডাক ও মায়ের মুখ মনে পড়ল— বাড়ির পিছনে বাঁশবনের কত দিনের ছায়াগহন, রাঙা রোদ গাছের মাথায় মাখানো সন্ধ্যা। যে সন্ধ্যা, যে শৈশব, যে বারাকপুর আর কখনও ফিরে আসবে না আমার জীবনে।

ওখান থেকে বার হয়ে গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাটের পৈঠায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

কালোর বৌভাতে শনিবার বাড়ি গিয়েছিলুম। দুপুরে খয়রামারির মাঠে যেমন বেড়াতে যাই,—গিয়েচি। একটি ঝোপের ধারে বৈঁচি গাছে কচি পাতা গজিয়েছে, মাথার ওপর নীল আকাশ, কী ঘন নীল, বাতাসে যেন সঞ্জীবনী মন্ত্র, মাঠের সর্বত্র ছড়ানো শিমুল গাছ ফুলে রাঙা হয়ে রয়েচে। ট্রেনে আসতে কাল শনিবারে রাঙা শিমুল ফুলের শোভা মুগ্ধ হয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেচি, মনে মনে ভাবি প্রতি বছর দেখচি আজ চল্লিশ বছর কিন্তু এরা তো পুরোনো হল না, কেন পুরোনো হল না—কেন প্রতি বৎসর শিরায় শিরায় আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়, তা কে বলবে?

গত শুক্রবার আবার বসিরহাট গিয়েছিলাম। মাঠে মাঠে শিমুল গাছগুলি রাঙা হয়ে উঠেচে ফুলে ফুলে, বৈঁচি ফুল ফুটেচে বাঁশবনের শুকনো ঝরা লতার মধ্যে, বাতাবী, লেবু ফুলের গন্ধও মাঝে মাঝে পাচ্চি। বসিরহাটে নামলুম বিকেলবেলা, প্রসাদের সঙ্গে বাঁধানো জেটির ঘাটে গিয়ে বসে রাঙা রোদ মাখানো ইছামতীর ওপারের দৃশ্যটি

দেখলুম। এই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে একদিন গৌরী বলেছিল—'গাড়িতে কেমন কলের গান হচ্ছিল, শুনছিলাম মজা করে'। সে কথাটি বললুম প্রসাদকে। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিদির সঙ্গে গল্প করলুম। পরদিন সকালে অর্থাৎ শনিবার কবি ভূজঙ্গভূষণ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বয়স চৌষট্টি—পঁয়ষট্টি বছর হয়েচে, কিন্তু মাথায় একটা চুলও পাকে নি, আমায় দুখানা বই দিলেন, চা খাওয়ালেন। গীতার কাব্যানুবাদ করচেন পড়ে শোনালেন, বেশ লোক।

এই দিন বিকেলের ট্রেনে ফিরলুম কলকাতায়, ওপথে গাছপালার সৌন্দর্য তেমন নয়। একটি মেয়ে ট্রেনে কেমন গান করে শোনালে। সন্ধ্যার সময় নীরদবাবুর বাড়িতে সাহিত্য সেবক সমিতির অধিবেশনে যেতে যেতে নির্জন অক্‌ল্যান্ড স্কোয়ারে বসে কি অপূর্ব আনন্দ পেলুম দু-একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে। এ আমার অতি সুপরিচিত পুরাতন আনন্দ। ছেলেবেলা থেকে পেয়ে আসচি, এতে অবিশ্যি আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। অনেকে আমার এ আনন্দটা বোঝে না, কিন্তু তাতে কি-ই বা যায় আসে—আনন্দের উপলব্ধিটুকু তো আর মিথ্যে নয়।

বাইরে কোথাও ভ্রমণের একটা পিপাসা আবার জেগে উঠেচে। ভাবচি আফ্রিকা যাব, শম্ভু আজ এসেছিল, সে বললে, তার কে একজন আত্মীয় ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি আপিসে কাজ করে, তারই সাহায্যে যদি কিছু হয় দেখবে ও চেষ্টা করে। আজ সারাদিন স্কুলেও ওই কথাই ভেবেচি, বেশীদূর কোথাও যেতে চাইনে। কিন্তু জগতের খানিকটা অন্তত দেখতে চাই।

সেদিন P.E.N. Club-এর যে মধ্যাহ্নভোজ হল বোটানিক্যাল গার্ডেনে—সেখানে অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী, অক্সফোর্ড থেকে এম-এ পাস করে এসেচে।

পরের বৃহস্পতিবার ঈদের ছুটিতে বাড়ি এলুম। আসার উদ্দেশ্য এই ফাল্গুনে বাংলার বনে, মাঠে অজস্র ঘেঁটুফুল ফোটে—অনেকদিন ঘেঁটুফুলের মেলা দেখি নি, তাই দেখব। তাই আজ সকালে এঞ্জিনিয়ার ও সাবডেপুটিবাবুর সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গেলুম চৌবেড়ে। সেখানে ওদের ইউনিয়ন বোর্ডের এক কাজ ছিল, মিটিয়ে সবাই মিলে যাওয়া হল দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ি। ভাঙা সেকেলে পুরোনো কোঠা, বট-অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে। তাঁর জন্মস্থান দেখলুম—দীনবন্ধু মিত্রের এক জ্ঞাতি ভাইপো বাড়ির পিছনে একটা সজনেতলা দেখিয়ে বললেন—ঐ গাছতলায় তখনকার আমলে আঁতুড়ঘর ছিল—ওইখানে দীনবন্ধু কাকা জন্মেছিলেন। আমি ও মনোরঞ্জনবাবু সার্কেল অফিসার স্থানটিতে প্রণাম করলুম। তারপর ঘেঁটুফুলের বন দেখতে দেখতে মাঠে মাঠে অনেকগুলো চাষাদের গ্রাম ঘুরে বেড়ানো গেল—চৌবেড়ে, নহাটা, সনেকপুর, দমদমা, মামুদপুর ইত্যাদি। বেলা একটার সময় এলুম কালীপদ চক্রবর্তীর বাড়ি। সেখানে কালীপদ খুব খাতির করলে, ওখান থেকে বার হয়ে আমি নামলুম চালকী। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করলুম। চালকীর পিছনের মাঠে কি ঘেঁটুবনের শোভা। দিদিদের বাড়ি বসে ঘটুর বিয়ের বড়মানুষি গল্প শুনলাম। সন্ধ্যার কিছু আগে বনগাঁয়ে গিয়ে খয়রামারির মাঠে ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপর কতক্ষণ বসে রইলুম। দূরে গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠেচে—মাথার ওপর দু-চারটা তারা। মনের কি অপূর্ব আনন্দ! কাছে ছিল একখানা বই—বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা। সেখানে ঐ রকম স্থানে ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে বসে পড়ে যেন একটা মসৃণ অনুভূতি নিয়ে ফিরলুম।

ঘোষপাড়ার দোলে এলুম অনেকদিন পরে। আজ সকালে বনগাঁ থেকে ট্রেনে বার হয়ে রানাঘাটে সাড়ে দশটায় শান্তিপুর লোকাল ধরলুম, দোলের মেলায় আসতে হল বেলা সাড়ে বারোটা। ছোট মাসীমা খেয়েদেয়ে ওপরে শুয়ে ঘুমিয়েছিলেন, আমি আসতে চা করে দিলেন। দুপুরের রোদে বাঁশবাগান আমার বড় ভাল লাগে—আর এই সব বাঁশবনের সঙ্গে আমার আশৈশব সম্বন্ধ। বিকেলে একটু ঘুমিয়ে উঠে দোতলায় গিয়ে একটি বড় সাংঘাতিক ঘটনা চোখের ওপর ঘটতে দেখলুম। একজন গুণ্ডা জনৈক যাত্রীর পকেট কেটেছিল, পাশেই ছিল

একজন হিন্দুস্থানী ভলান্টিয়ার, সে যেমন ধরতে গিয়েচে, আর গুণ্ডাটি ওকে মেরে দিয়েচেছুরি। আমি যখন গেলুম, তখন আহত লোকটাকে ওদের তাঁবুতে এনে শুইয়েচে, খুব লোকের ভিড়। একটু পরেই সে মারা গেল। ওদিকে সেই গুণ্ডাটিকেও পুলিশে ধরে ফেলেচে—তাকে লোকে মেরে আধমরা করেছে। মেলাসুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত— সবাই বলচে, এমন কাণ্ড কেউ কখনও এমন স্থানে ঘটতে দেখে নি! আমি আরও খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে চলে এলুম। রায়বাড়ির পাশের একটা ঘন বনের মধ্যের পথ দিয়ে ঢুকে একটা শুকনো পুকুরের পাড়ে ঘাসের ওপর গিয়ে বসলুম। ফিরে যখন আসচি তখন একটা শিমুল গাছের বাঁকা ডালপালার পেছনে পূর্ণচন্দ্র উঠেচে—স্থানটি আফ্রিকা হতে পারতো, কি নির্জন, আর কী ভীষণ জঙ্গল—বাংলাদেশের গ্রামে এমন জঙ্গল আছে, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে? কি মহিমময় দৃশ্য সেই উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের, সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে, আঁকাবাঁকা শিমুল গাছের ফাঁকে। আজ আমার ঘোষপাড়ার দোলে বেড়াতে আসা সার্থক হল, মনে হচ্ছে শুধু এই দৃশ্যটা দেখবার সুযোগ পেলুম বলে। সেদিনের সেই খয়রামারির মাঠে শুকনো ডালের ওপর বসে থাকা ঘেঁটুবনের মধ্যে, আর আজকার কামারপুকুরের পাড়ের জঙ্গলে এই পূর্ণচন্দ্রের উদয়—এবারের দোলের ছুটির মধ্যে এই দুটো ঘটনা জীবনের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্যে আসন পেতে পারে।

তারপর মাসীমা ছাদে বসে চা করে দিলেন, লুচি ভাজলেন, আমি কাছে বসে গল্প করলুম। অনেকদিন আগের কথা তুললেন, আমি, গৌরী, মণি ও মাসীমা ছাদে বসে কত তাস খেলতুম। আমি তো ভুলেই গেছলুম, এতদিন পরে আবার সেকথা মনে এল। সুপ্রভার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

এর মধ্যে একদিন কার্জন পার্কে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে জনৈক জাপানী চোরের আত্মকাহিনী পড়ছিলুম। বইখানাতে আছে, সে নিজে ভয়ানক বদমাইশ থেকে যীশুখ্রীস্টের বাণীর প্রভাবে কেমন করে হঠাৎ ভাল লোক হয়ে পড়ল। আমার ডাইনে এক গাছে ফুটেচে চেরী ফুল, সামনে লাটসাহেবের বাড়ির কম্পাউন্ডে সারি সারি দেওদার গাছে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে—সেদিন ভুলে গেলুম যে কলকাতায় বসে আছি—ট্রাম, বাস আসচে যাচ্চে,সে যেন আমার চোখেই লাগে না—আমি যেন বহুদূরে হিমালয়ের কোন অরণ্যে বসে আছি—সে গম্ভীর হিমারণ্যের নিস্তব্ধতা শুধু ভঙ্গ করচে তুষার-নদীমুক্ত স্রোতধারা আর দেওদারের শাখা-প্রশাখার মধ্যে বায়ুর স্বনন।

তারপরেই একদিন গেলুম রাজপুরে। সন্ধ্যার সময় গিয়ে মাঠের ধারে বসলুম, মাথার ওপরে এক-আধটা নক্ষত্র উঠেচে, হুহু দক্ষিণ হাওয়া বইচে, সামনে একটা বটগাছ, দূর-বিসর্পী দিকচক্রবাল সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হল—গতশনিবারে শার্লি টেম্পলের ছবি দেখে যেমন আনন্দ পেয়েছিলুম, এ যেন তার চেয়েও বেশী—যদিও শার্লিকে আমার খুবই ভাল লাগে এবং ঐ ছোট্ট মেয়েটির ছবি থাকলেই আমি দেখি।

'To those who have some feeling that the natural world has beauty in it, I would say, cultivate this feeling and encourage it in every way you can. Consider the seasons, the joy of spring, the splendour of the summer, the sunset colours of the autumn, the delicate and graceful bareness of winter trees, the beauty of snow, the beauty of light upon water, what the old Greek called the unnumbered smiling of the sea.'

'In the feeling for that beauty, if we have it, we possess a pearl of greatprice.'

—Lord Grey of Falloden

এ দিনটি প্রথম এক বান্ডিল পরীক্ষার কাগজ সুনীতিবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলাম।কথা ছিল মণিকুন্তলারা আজ রাজপুরে যাবে পিকনিক করতে, ৮/৫৪ লোকাল ট্রেনে। আমিও ওদের সঙ্গে যাব, কিন্তু স্টেশনে যেমনি পা

দেওয়া অমনি ট্রেন গেল চলে। পরের ট্রেনে গেলাম। বেগুনের মা খুব রান্নাবান্না করেচেন গিয়ে দেখি। মণিকুন্তলাকে বললুম—দু-দিন তোমার ওখানে গিয়ে দেখা পাই নি, এখানে এসেচ ভালই হয়েচে। আমরা খুব আনন্দ করে চা ও কলার বড়া খেলাম। মণির বোন রেণুর সঙ্গে আলাপ হল, বেশ মেয়েটি, বুদ্ধিমতী খুব। রেণু যে ভাল নাচতে পারে, এ আমি এই প্রথম শুনলুম মণির মুখে। রেণু আমার কাছে এসে বললে—গল্প বলুন। ছেলেমানুষ—দু-একটি ভূতের গল্প শোনালুম। তারপর সে আর আমার কাছছাড়া হয় না। যেখানে আমি যাব, সে সেইখানেই আছে উপস্থিত।

বললে—আপনাকে আমার বড় ভাল লাগচে। তারপর সবাই মিলে বোসপুকুরে নাইতে গেলুম। খুকীকে ডেকে নিলাম ওর বাড়ি থেকে। বোসপুকুরে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গেলাম। তারপর আর একটা পুকুরে নাইলাম।

রেণু বললে—এক-একজনকে কেমন হঠাৎ বড় ভাল লাগে, আপনাকে যেমন লেগেচে। দেখচেন না সব সময় আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছি।

তারপর বাড়ি এসে আমার আঙুলগুলো মটকাতে লাগল। বললে—আর-জন্মে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল।

আমি বললুম—আমি তোর বাবা হব, তুই আমার মেয়ে হবি?

সে বললে—তাহলে মেয়ের মতই দেখুন। বলে—পাশে এসে আমার কাঁধে মাথা রেখে বসল।

মণিকুন্তলা গান গাইলে আর ও নাচলে।

‘মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমো, নমো নমো।’

বাবার শোকে রেণু নাকি পূর্বজন্মে আত্মহত্যা করেছিল, ওকে কে বলেচে নাকি। অদ্ভুত মেয়ে! ওর দিদি জ্ঞানবাবুর বাড়ি গেল—ও গেল না। বললে—ওরা মোটরে যাক, আপনি আর আমি যাব হেঁটে।

সারা পথ ট্রেনে দু-বোনে গান গাইলে। বালিগঞ্জে জোর করে আমায় নামিয়ে নিলে। একটা গন্ধরাজ ফুল কোথা থেকে তুলে নিয়ে এসে আমায় দিলে। চেয়ারের পাশে জ্যোৎস্নায় বসে রইল সব সময়। বললে—ঠিকানা দেবেন, বাড়ি গিয়ে পত্র দেব। দুঃখ এই যে শীগ্‌গির চলে যাচ্চি। আগে কেন ভাব হল না।...ইত্যাদি। অদ্ভুত মেয়ে বটে! ভারী ভাল লাগে ওকে, সব সময়ে ‘বাবা’ বলে ডাকবে আমাকে।

রেণুর কথাটা কেমন এক ধরনের আনন্দে আমায় ক-দিন যেন ডুবিয়ে রেখেচে। এমন একটা মনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল—যার সন্ধান পথেঘাটে পাওয়া যায় না। তাই সবাইকে গল্প করে বেড়াচ্চি। আজ বিকেলে নীরদবাবু, বউঠাকরুন, পশুপতিবাবু, মিসেস দাশগুপ্ত সবাই মিলে গড়িয়ার মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে হারমোনিয়াম গিয়েছিল, স্টেশনে নেমে মাঠের মধ্যে বসে আমরা গান গাইলুম। আমি হালুয়া তৈরি করলুম উনুন জ্বেলে। চা খাওয়ার পরে গল্পগুজব হল। আমার কিন্তু রেণুর কথা বার বার মনে হয়ে বিকালটা কি রকম হয়ে গেল। কেবলই মনে হয়, আহা, রেণু থাকলে বেশ হত! ওদের কাছে কথাটা বললুম। ওরা তো শুনেই বললে, আগে কেন বললেন না, আমরা গিয়ে তাকে নিয়ে আসতাম।

কাল রেণুদের বাড়ি গিয়েছিলুম। যেমন গিয়েচি ও তখনই দৌড়ে একখানা পাখা নিয়ে আমায় বাতাস করতে বসল, বললে—শরবৎ করে নিয়ে আসি, দাঁড়ান। তারপর সব সময়েই মণি, আমি আর ওর বাবা গল্প করচি, রেণু আমার পাশে জানলার ধারে বসে রইল। লক্ষ্মী—পুজো গিয়েচে কাল ওদের বাড়িতে, তা ও ভুলেই গিয়েচে। ওর বাবা বলে, আপনি এসেছেন আর ও সব ভুলে গিয়েচে। বাইরের বারান্দাতে জ্যোৎস্নায় মণি ওর কলেজ-জীবনের কত কথা বললে। রেণু বললে—আপনার জন্যে রজনীগন্ধা রেখেছিলুম, শুকিয়ে গিয়েচে, পদ্ম আছে, দেব এখন? আসবার সময় নিচু পর্যন্ত নেমে এল সঙ্গে, আর কেউ নয়, মণি এসেছিল, কিন্তু ওর বাবা ডাকলেন বলে আমি

আবার ওপরে গেলুম উঠে, তাই মণি এবার আর আসে নি কিন্তু রেণু দু-বারই এল। আমার কোলের কাছটি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি বুধবারে আসবেন তো? আমি পথের দিকে চেয়ে থাকি, কখন আসবেন। কি সুন্দর মেয়ে!

ছ-বছর পরে খুদুদের ওখান থেকে বেড়িয়ে এসে দুপুরবেলাতে মনে বেশ আনন্দ হল, কারণ পথে পথে নতুন-পাতা-ওঠা গাছ, কোকিলের ডাক। রাত দশটার পরে জ্যোৎস্না উঠেচে, চেয়ার পেতে বাইরে বসে দেখি আর ভাবি, কাল ঠিক জ্যোৎস্না উঠতে দেখে মণি আমার সঙ্গে তর্ক করলে যে এটা নাকি শুক্লপক্ষ—ওদের বাড়ির ছাদে। তারপর তিনু আর আমি খয়রামারির মাঠে গেলুম বেড়াতে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে—পথে ঝোপেঝাড়ে কত কি ফুলের সুগন্ধ। এই গ্রীষ্মকালে বনঝোপে রাত্রে নানারকম বনফুল ফোটে—তার মধ্যে বনমল্লিকা বেশি। মনে এমন একটা অদ্ভুত আনন্দ ও উত্তেজনা আসে যে মনে হয় খয়রামারির মাঠেই সারারাত বসে থাকি। খুকুর কথা ও রেণুর কথা যত মনে হয় আর তত আনন্দ বেশি পাই। মাথার ওপরে কেমন নক্ষত্র উঠেচে, এই জ্যোৎস্নারাত্রে সারা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে যে প্রীতি ও ভালবাসা উৎসারিত হচ্চে, পবিত্র প্রাণের অবলম্বনে তারা আমার জন্যে, তোমার জন্যে, সেই প্রীতি ভালবাসার কিছু অংশ homely ভাবে পরিবেশন করবে। কত রাত্রে ফিরে এলুম, তবুও ঘুম আসে না। একে গরম, তাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস মনের মধ্যে, কি করে ঘুমোই? জীবনে আজকাল বড় বেশি আনন্দ পাচ্চি, খানিকটা প্রকৃতি থেকে, খানিকটা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থেকে।

নৌকো করে সকালে বারাকপুর যাচ্চি। এ সময়টা আর কখনও ইছামতীতে নৌকো করে যাই নি, বর্ষাকালের চেয়ে প্রকৃতি এখন আরও সবুজ—সত্যিই আরও সবুজ। গাছে গাছে নতুন শোভা। চারিদিকে পাখি ডাকচে পিড়িং পিড়িং, কোকিল ডাকচে, ঠ্যাং উঁচু করে বকগুলি শেওলার দামে বসে আছে—শিমুল গাছগুলোর রূপ কি অদ্ভুত! শিমুল ষাঁড়া আর বাব্‌লা গাছে নদীর শোভা বাড়িয়েচে। আমি বসে কাগজ দেখচি মেয়েদের, প্রায়ই সব পাস করিয়ে দিচ্চি—মেয়েদের ফেল করাতে মন সরে না—আর রেণুর কথা ভাবচি, কাল খুদু বলেছিল বিকেলে—'আপনার সঙ্গে কথা বলে যেমন অদ্ভুত আনন্দ পাই, এমন আর কারও সঙ্গে কথা বলে পাই নে' সেই কথা ভাবচি। খুদু কাল যেতে বলে দিয়েচে কিন্তু আজ রাত্রেই আমি যাব চলে, সুতরাং কাল কি করে তার সঙ্গে আর দেখা করব? এ ক-দিনই কি অদ্ভুত আনন্দেকাটচে!

আমাদের ঘাটে গিয়ে নৌকো লাগল। এবার বনজঙ্গল কেটে দেশের শোভা অনেকটা নষ্ট করে ফেলেচে। দুপুর হয়ে গিয়েছিল, আমি কুঠীর মাঠের দিকে একটু বেড়াতে গেলুম—পুঁটি দিদিদের বাড়ি ব্যাগ রেখেই। বাঁশবনে পাতা পুড়িয়েচে—চারিদিক যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্চে। স্নান করতে গেলুম ঘাটে, সেই বননিমের ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে, খুকু আর আমি সেই ঘাটে নইতে আসতুম, খুকু ওর তলায় দাঁড়িয়ে থাকত—মনে হল যেন কতকাল হয়ে গেল। খেয়ে বিশ্রাম করে চড়কতলায় গেলুম। উমা এসেচে অনেকদিন পরে, তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। মণিকুন্তলার পত্রখানা ও আবার দেখলে। চড়কতলায় এসে কতযুগ পরে কাদামাটি দেখি। সোনা, নলিনীদির মেয়ে তাকেও দেখুলুম কতকাল পরে। পাগ্‌লা জেলে সন্ন্যাসী সেজেচে,ওকে কত ছোট দেখেচি। অজয় মণ্ডল বড় বুড়োহয়ে গিয়েচে। সে জিজ্ঞেস করলে আমার বাড়ির কথা, আমার ভাই কেমন আছে।

চালতেপোতার বাঁধ দিয়ে যেতে যেতে এখন এই অংশটা লিখচি। কি অপূর্ব গাছপালার শোভা,—বারাকপুরের পুলে,—আর এই চালতেপোতার পুলে। নদীর জলের ও হাক্‌রা বনের এই যে সুগন্ধ এটা আমাদের ইছামতীর নিজস্ব। এবার গুড ফ্রাইডের ছুটিটা সবরকমে বড় আনন্দেই কাটল। এত আনন্দ জীবনে অনেকদিনই পাই নি।

রোদ রাঙা হয়ে আসচে। ডাইনে চালকীর পথের ধারে কচি পাতা ওঠা শিমুল গাছটার দিকে চাইলে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। যখন এসব দৃশ্য দেখি, তখন অনর্থক অর্থব্যয় করে দেশভ্রমণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। এর চেয়ে ভাল কোন্ দেশ আছে? এত বিচিত্র বনশোভা কি ট্রপিক্যাল আফ্রিকার? একটা পাপ্‌ড়ি-ফাটা শিমুল গাছের কি

শোভা হয়েচে? পাপ্‌ড়ি ফেটে তুলো বেরিয়ে আছে আঁকাবাঁকা গাছের ডালে ডালে। নদীর জলে মাঝে মাঝে কচ্ছপ ভেসে উঠে মুখ বার করে 'ভু-উ-উস্' শব্দে নিঃশ্বাস নিচ্চে।

আজ অনেকদিন পরে জালিপাড়ার সেই বায়োস্কোপওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু-চারজন আছে বাল্যজীবনের আলাপী, তাদের সঙ্গে যখন পথেঘাটে এইভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তখন বড়ই আনন্দ হয়। একজন আমাদের 'আর্চারদা', একজন হচ্চে চালকীর শশিবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছিল মোল্লাহাটীতে আম কিনতে সেই যে ছোকরা, যাকে আমি ও ছোটমামা আমাদের বাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিলুম, আর একজন হচ্চে পেরুর কন্‌সাল ডন মটয়াস্‌কি, যাকে পায়েস খাইয়েছিলুম, বনগাঁয়ের বাসা থেকে তৈরি করে। এই বছরটাতে কি যোগ আছে জানি নে, যত সব পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল আবার—যেমন ধরি মণিকুন্তলাদের সঙ্গে, এই বছরই বিশেষ করে আবার যোগ পুনঃস্থাপিত হয়েচে রাজপুরের অন্নপূর্ণাদের সঙ্গে, রমা—প্রসন্নদের সঙ্গে, সুরেনদের সঙ্গে। মিনুও সেদিন আমার কথা গ্রামে এসে বলেছিল বুড়োর কাছে, বুড়ো বল্‌লে, সেদিন রাত্রের ট্রেনে বনগাঁ থেকে আসার সময়ে। এই বছরই কতকাল পরে দেখা হয়ে গেল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে—সেদিন রাণাঘাট স্টেশনে। আর্চারদার সঙ্গে রাণাঘাট মেডিকেল মিশনে চড়কের দিন দেখা হল। উমার সঙ্গেও বারাকপুরে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরে। এই বছরেই ডাঃ পি. সি. রায়দের আড্ডাতে আবার যাচ্চি ১৯১৪ সালের ছাত্রজীবনের মত। এই বছরেই বনগাঁয়ে মিনুদের বাসায় গিয়ে রোজ গান শুনি, সেখানে ১৯১৮ সালের পরে আর কোনদিন পদার্পণ করি নি। আবার এই গত গ্রীষ্মাবসানেই বাগান-গাঁয়ে রাখালী পিসিমার বাড়ি গিয়েছিলুম, তের বছর পরে। এই বছরেই এই সেদিন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সেই ডিস্‌পেনসারি ঘরটাতে গিয়ে গিরিজাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে কথা বলে এলুম—যেখানে আমার ন-বছর বয়সের শৈশবে শেষবার গিয়েছিলুম। এ সবের চেয়েও বড় ও আমার কাছে সকলের চেয়ে মধুর—এই বছরেই এই যেদিন শনিবার গিয়ে পানিরে সেই ওপরের ঘরটাতে রাত্রিযাপন করলুম বহুকাল পরে, আমার বিয়ের পরে যে ঘরটাতে আমি ও গৌরী থাকতুম। ওদের সঙ্গেওএকটা আবার যোগ স্থাপিত হয়েচে এই বছরেই; জীবনে কখনোও যে আবার যাব তার আশা ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে ওদের বাড়িটার পিছনে কি আছে জানতুম না—তা এবার জেনেছি। বহুকাল পরে মুরাতিপুরে মামার বাড়ির ওপরের ও নিচের ঘরে এবার দোলের সময় আবার রাত্রি কাটিয়ে এসেচি। আন্নির সঙ্গে দেখা হয়েচে এ বছরে, দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে তাও এ বছরে।

অপূর্ব ১৩৪২ সাল কেটে গেল আমার পক্ষে। পুরোনো বন্ধুদের হারাতে চাই নে, বড় কষ্ট হয়। যে যেখানে আছে, যাদের কতভাবে, কতরূপে পেয়েচি—সব ভাল থাকুক, মাঝে মাঝে তাদের যেন দেখতে পাই।

ওঃ, সেই বায়োস্কোপওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে কি আনন্দই পেয়েছিলুম আজ বিকেলে! ভাল কথা—লিখতে ভুল হয়ে গিয়েচে, এই কালই বিকেলে ভাগলপুরের যতীনবাবুর মেয়ে সত্যপ্রিয়ার সংবাদ পেয়েচি।

কেবল দুটি কষ্ট মনে রয়েচে—উষার সঙ্গে দেখা হয় নি বহুকাল—ভাবচি গরমের ছুটিতে কি পুজোর ছুটিতে একবার এলাহাবাদে যাব। আবার একদিন রাজপুরের বিন্দুদের শ্বশুরবাড়িতে গেলুম রাধানাথ মল্লিকের লেনে। বিন্দু বড় ভাল মেয়ে, ভারি আদর-যত্ন করলে। একে ছোট অবস্থায় দেখেছিলুম—আবার দেখলুম এই বছরই প্রথম। আমার বড়মামার ছেলে গুলুকে আজ আট বছর পরে এই বছরই দেখলুম। কত বছর পরে কুসুমের সঙ্গেও দেখা হয় গত ১৫ই মে। রেণুদের বাড়ি আর একদিন গিয়েছিলুম। ওরা ছেলেমানুষ, ভূতের গল্প শুনে খুব খুশি। আমায় আবার একটা লেবেঞ্চুশের কৌটা উপহার দিলে রেণু। বললে, আপনি আমাদের মত ছেলেমানুষ তাই এটা দিলাম আপনাকে। ওরা কাল রবিবারে চাটগাঁ চলে গেল, আমি সকালে তুলে দিতে গেছলুম, ওরা ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিতে বললে। রেণুর তো কথাই নেই, সে জিতেনকে বললে, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।

রেণুর পত্র পেয়েচি। সে গিয়েই পত্র লিখেচে, আর তাতে লিখেচে, 'আসুন শিগ্‌গির একবার চাটগাঁয়ে। আমি আর একদিন রাজপুরে গিয়েছিলাম। যদুনাথ ও খুকী বলছিল, রেণু আর একদিন ওখানে গিয়েছিল বেড়াতে, সেদিন

আমি ছিলাম না, তাই শুধুই আমার নাম করেচে। ...ওইখানে বাবা শুয়েছিলেন, এখানে বসে বাবার সঙ্গে কত গল্প করেছিলুম...শুধু এই সব কথাই হয়েচে। সেদিন রাজপুর থেকে ফিরবার পথে জ্যোৎস্নালোকিত প্লাটফর্মে বসে বসে কেবল এই সব ভেবেচি।

আজ একটি অদ্ভুত তালজাতীয় গাছের কথা পড়লুম, নাম Microzeminar Plum! অস্ট্রেলিয়ার Tambourine mountain-এ বিস্তর রয়েচে। এই গাছ নাকি বহুকাল বাঁচে। সেখানে পনেরো হাজার বছর একটা গাছ বেঁচে ছিল, সেটা দুশো ফুট উঁচু হয়। Prof. Chamberlain সেখানে অত উঁচু গাছ দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। পনেরো হাজার বছর বয়সী প্রাচীন গাছটা কে সেদিন কেটে ফেলে দিয়েচে, তাই নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে হৈ-হৈ পড়ে গিয়েচে, ব্রিস্‌বেনের টেলিগ্রামে প্রকাশ (রয়টার, ৮ই মে, ১৯৩৫, অমৃতবাজার পত্রিকাতে পড়লুম), বাকি গাছ যা সব আছে, তার মধ্যে একটার বয়স এগারো হাজার বছর, বাকিগুলি তিন-চার হাজার বছরের শিশু।

কাল স্কুলের ছুটি হবে। আজ ছেলেরা খুব খাওয়ালে। আমি নানা জায়গায় ঘুরে টরুকে সঙ্গে নিয়ে রমাপ্রসন্নদের বাড়ি গেলুম। কুসুমের সন্ধান করে তার ঠিকানা পেলুম। টরুকে সঙ্গে নিয়ে তেত্রিশ বছর পরে গিয়ে কুসুমের সঙ্গে দেখা করলুম। আমার ন-বছর বয়সে কুসুম আমায় কত গল্প বলত। এখন তার বয়স ষাট-এর কম নয়—গরিব, লোকের বাড়ির ঝি। সে চেহারাই আর নেই। ওর সে চেহারা আমার মনে আছে। মানুষের চেহারার কি ভয়ানক পরিবর্তন হয়!

তপুর সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েচে, আজ দিনতিনেক আগে। তাকে দেখেছিলুম ছ-বছরের ছেলে—এখন তার বয়েস তের-চৌদ্দ বছর। এ বছরটিতে পুরোনো আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হচ্চে।

আজ এ বছর গ্রীষ্মের ছুটির প্রথম দিন এখানকার। বাড়িতে কেউ নেই, পাড়া নির্জন, একমাত্র পাঁচী ও ন-দিদি আছে। বকুলতলায় দুপুরে অনেকক্ষণ বসে Valia গল্পটি পড়ছিলুম। একটা দাঁড়াশ সাপ সুপুদের নারিকেল গাছটাতে উঠে পাখির বাসায় পাখির ছানা খুঁজছে। আরপাখিগুলো তাকে ঠুকরে কি বিরক্তই করচে। গঙ্গাহরি, তুলসী, হাজু সবাই কাছে এল। দুপুরের পরে একটু ঘুমিয়েচি, নির্জন মেঘমেদুর অপরাহ্ণ, বাঁশবনের দিকে গরু চরচে, মেজ খুড়ীমার বাড়ির দিক থেকে মেজ খুড়ীমার গলার সুর পাওয়া যাচ্চে। বাবার একটা শ্লোকের খানিকটা মনে এল ঘুমের ঘোরে। এত স্পষ্ট মনে এল যেন বাবার সঙ্গে বসে আমি কবিতা আবৃত্তি করচি বাল্যদিনের মত। কথাটি এই—'নীচৈস্বভিরুচিঃ' এই টুকরোটুকু যেন উদ্ভট শ্লোকে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম। আমাদের ভিটের পিছনের বাঁশবাগানে গেলুম বেড়াতে ও আমগাছের ফল গুনতে। এখান থেকে বেলেডাঙার মাঠ। কুঠীর মাঠের বাড়ির দু-ধারে বন কেটে উড়িয়ে দিয়েচে—সেই লতাবিতান, সেই ঝোপঝাড় এবার কোথায় উড়ে গিয়েচে। দেশময়ই দেখচি এই অবজ্ঞা। বেলেডাঙার পথের ধারে একটা কামারের দোকানে দশ-বারো জন লোকে বসে আছে—তার মধ্যে বিরাশি বছরের সেই হরমোতীও বসে আছে। বহুবছর আগের মোল্লাহাটী কুঠীর সাহেবদের গল্প সে করলে। পুলের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালুম—এক ফকির সেখানে গোয়ালপাড়ার একটা মেয়ের সঙ্গে বসে গল্প করচে। আমায় আবার সে ভক্তি করে একটা বিড়ি খাওয়ালে। আমি তাকে একটা পয়সা দিলাম। হরমোতী এসে বললে—'বাবু, দুক্‌খের কথা বলব কি, আমার ছেলে বলে, তোমাকে আর ভাত দেব না। বিরাশি বছর বয়েস আমার, কোথায় এখন যাই আমি এই বেদ্ধ বয়সে?"

সন্ধ্যাবেলা ন-দির সঙ্গে রেণুর গল্প করি। রাত্রে এখন ঢোল বাজচে, জিতেন কামারের বাড়ি নাকি মনসার ভাসান হচ্চে। একবার ভাবচি যাই, কিন্তু বাড়িতে আমি একা, তার ওপর আজ অমাবস্যার রাত—জিনিসটা-পত্রটা আছে, ফেলে রেখে ভরসা করে যেতে পারচি নে।

রোয়াকে বসে লিখচি ভারী আরামে, বকুলগাছে, কুলগাছে কত কি পাখি ডাক্—চেবিল্বপুষ্পের মধুর গন্ধ ভেসে আসচে বাতাসে—দুটো বিড়ালছানা আমার মাদুরের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করচে, সামনের রাস্তা দিয়ে ছেলেরা আম পাড়তে যাচ্চে, জেলেরা মাছ নিয়ে যাচ্চে। একবার পটল যাচ্ছিল, আমি ডেকে বললুম—ও পটল, উমা

চলে গিয়েচে? পটল বড় লাজুক মেয়ে। পেয়ারাতলা পর্যন্ত এসে নিচুমুখে দাঁড়িয়ে বললে—দিদি ২৭শে জ্যৈষ্ঠ চলে গিয়েচে দাদা।

ছেলেবেলার সেই বুড়ো আকন্দ গাছটায় থোলো-থোলো ফুল ফুটেচে। পাখির ডাক আর পুষ্পের সুবাসে মাতিয়ে রেখেচে।

বিকেলে হাটে গেলাম। এ বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রথম হাট। পথেই আফ্‌জলের সঙ্গে দেখা, সে হাটে পটল বেচতে যাচ্চে। তুঁততলার স্কুলের ভিটে দেখিয়ে বললে—দা-ঠাকুর, এখানে মোরা পড়িচি, কত আনন্দই করিচি এখেনে, মনে আছে?

তা আছে। তুততলার স্কুলের কথায় হাঁড়ি-বেঁচা মাস্টারের কথা উঠল, আর কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো, সে কথাও উঠল।

অনেকদিন পরে গোপালনগরের হাটে গিয়েচি। সেই আশ্বিন মাসের পুজোর ছুটির পর আর আসি নি। সবাই ডাকে, সবাই বসতে বলে। মহেন্দ্র সেক্‌রার দোকান থেকে আরম্ভ করে সবজির গোলা পর্যন্ত। হাটে কত ঘরামী ও চাষী জিজ্ঞেস করে—কবে এলেন বাবু?

ওদের সকলকে যে কত ভালবাসি, কত ভালবাসি ওদের ওই সরল আত্মীয়তাটুকু, ওদের মুখের মিষ্ট আলাপ! যুগল বৈষ্ণব এসে আমার ছেলেবেলার গল্প করলে, আশু ঠাকুর এসে আমায় অনুযোগ করতে বসলো, আমি বিয়ে করচি না কেন এই বলে। ব্রজেন মাস্টার নতুন লাইব্রেরি দেখাতে নিয়ে গেল, মনু রায় তার বিড়ির দোকানে ডেকে নিয়ে বসিয়ে বিড়ি খাওয়ালে, যুগল ময়রা নতুন তৈরি দোকানঘরে বসিয়ে তামাক সেজে দিলে—এদের যত্ন—আত্মীয়তার ঋণ কখনো শুধতে পারবো না। গৌর কলুর দোকানে চা কিনতে গেলাম, সে আরআমায় কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সেও আমার এক সহপাঠী, ওই তুঁততলার স্কুলে ১৩১০-১১ সালে তার সঙ্গেও পড়েচি। সে সেই কথা ওঠালে, আবার একবার হিসেব হল কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো। এক বছর পরে দেশে যখন আসি, সবাই আমায় পেয়ে আবার সেই পুরোনো কথাগুলো ঝালিয়ে নেয়।

এ বছরটা কলকাতায় বড় কর্মব্যস্ত জীবন কাটিয়েছি। এই একটা এদের সরল সাহচর্য, সুপ্রচুর গাছপালার সান্নিধ্য, নদী, মাঠ, বনের রূপবিলাস আমার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ জুড়িয়ে দেয়। গত দেড় মাস রোজ রাত সাড়ে তিনটার সময় উঠে ইলেকট্রিক লাইট জ্বেলে খাতা দেখতে বসেচি, সেই কাজ শুরু করেচি আর রাত বারোটা পর্যন্ত চলেচে নানা কাজ, চাকরি, লেখা, পার্টি, টাকার তাগাদা, বক্তৃতা করা ও শোনা, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি দেখা করতে যাওয়া, আমার এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা—সমানে চলেচে। এদিকে শুয়েচি রাত সাড়ে বারোটায়—আবার ওদিকে উঠেচি রাত সাড়ে তিনটাতে। এখানে এসে বেঁচেছি একটু মন ছড়িয়ে বিশ্রাম করে।

হাট থেকে এসে নদীর ধারের মাঠে বেড়াতে গিয়ে এই কথাই ভাবছিলুম। ঝিরঝির করচে হাওয়া, সোঁদালি ফুল ফুটেচে নদীর ধারে। কোকিল ডাকচে—বেলা পড়ে গিয়েছে একেবারে—কি সুন্দর যে লাগছিল! আর উঠতে ইচ্ছে যায় না নদীর ধার থেকে, কি অদ্ভুত শান্তি!

এখন বসে লিখচি, অনেক রাত হয়েচে। বাঁশজঙ্গলের মাথায় বিশাল বৃশ্চিক রাশি অর্ধেক আকাশ জুড়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ করচে। অনেক দূরে একটা কি পাখি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একঘেয়ে কু-স্বর করে ডাকচে। নায়েব-বাড়ির দিকে একপাল কুকুর অকারণে ঘেউ ঘেউ করচে।

আজ সকালে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর গেলুম সকালের গাড়িতে। অনেক জায়গায় গেলুম, কারণ বাবার সঙ্গে সেই ছেলেবেলায় একবার গিয়েছিলুম, আজ সাতাশ বছর আগে। আবার সেই রাজবাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, জীবনের যে সব স্মরণীয় ঘটনা ঘটেচে এর পরে। সেই ব্রাহ্মসমাজ, সেই A. V. School, সেই লীলাদিদিদের বাড়ি। লীলাদির সঙ্গে দেখা হল না।

বিকেলে আজ সইমাদের বাড়ি বেড়াতে গেলাম। বাণীকে দেখলুম অনেকদিন পরে, সে এত মোটা হয়েচে যে তাকে চিনতে পারা যায় না। তার দুটি সতীনঝিও এসেচে, ছেলেমানুষ—কিন্তু একজন আবার ওদের মধ্যে বিধবা। আমাদের দেশে বিধবা হবার যে কি কষ্ট—অন্নপূর্ণার মুখে, ধীরেনের খুড়তুত বোনের গল্প শুনে বুঝতে পারি।

তারপর গেলুম কুঠীর মাঠে বেড়াতে। যেতে যেতে দেখি নদীর ধারে মাধবপুরের চরের গাছপালার গায়ে মেঘে চাপা হল্‌দে রোদ পড়েচে—তার নিছক সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ, অভিভূত করলে। বেলা সাড়ে ছটা হবে, সন্ধ্যার দেরি নেই, সেই শান্ত গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে উষ্ণমণ্ডলের বনপ্রকৃতি, সূর্য, আকাশ, নদী, মাঠ, তার সমস্ত ইন্দ্রজাল, সমস্ত রূপ-বিভব আমার চোখের সামনে মেলে ধরেচে। শুধু শিমুল গাছের ডালগুলোর আঁকাবাঁকা সৌন্দর্যময় রূপ, মেঘপর্বতের পাশ দিয়ে বলাকা সারির ভেসে যাওয়া, শুধুই বনফুলের দেবলোকের দুলুনি, আর বন্যপাখির গান। কতবার দেখেচি, আজ বত্রিশ বছর ধরে দেখে আসচি। কিন্তু এরা কখনো পুরোনো হল না আমার কাছে। কখনও যেন হয়ও না, এই প্রার্থনা করি, এদের আসন যেন মৃত্যুঞ্জয় হয় আমার জীবনে।

অতি ভয়ানক দুর্যোগ, ভয়ানক বর্ষা। আজ ক-দিন চলেচে এমন। খানা ডোবা সব ভর্তি, জল থৈ থৈ করচে। এমন ভয়ানক বর্ষা জ্যৈষ্ঠমাসে দেখেছিলুম কেবল সেইবার, যেবার কলকাতা থেকে আবার ফিরে গেলুম বেলাদের তত্ত্ব নিয়ে, যেবার খুকুর সঙ্গে প্রথম আলাপহয়, ১৯৩২ সালে। তারপর কত পরিবর্তনই না হয়ে গেল জীবনে। ১৯৩২ সালের সেই সময়ের এবং ১৯৩৬ সালের এই আমিতে বহু তফাৎ হয়ে গিয়েচে।

বিলবিলের ডোবাতে ব্যাঙ ডাক্‌চে। বুধো, কেতো এরা এই ভয়ানক দুর্যোগ অগ্রাহ্য করে ভিজতে ভিজতে আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে। সাবি ওদের বাড়ি থেকে বিড়ি নিয়ে এল আমার জন্যে, কারণ ওবেলা ওর ভাইকে বলেছিলুম এনে দিতে। মনোরমা আবার দুটো কলমের আম এনেছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলে। আমি পাঁচীর বাড়ি গেলুম মাংসের ভাগ নিতে, কারণ ওখানে পাঁঠা কাটা হয়েচে সকালে। পাঁচী চা করে দিল, শম্ভুর অসুখের জন্যেঅনেক দুঃখ করলে।

সবাই ওকে ঘৃণা করে আমাদের গাঁয়ে। কিন্তু আমি দেখি ও ঘৃণার পাত্রী নয়, অনুকম্পার পাত্রী। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল, তখন ওর বয়েস ছিল মোটে তের বছর—কি বা বুঝত বিয়ের ? সে স্বামী মারা গেল, তখন ওর বয়েস বছর পনেরো। ওদের ওই গরিব সংসার, ভাইগুলো অপদার্থ, কেউ এক পয়সা রোজগার করে না। ভাইয়ের ছেলেমেয়েগুলো একবেলা খায়, একবেলা খায় না। ওদের এই দুঃখ ঘুচোতে ও এই কাজ করেচে কিনা তাই বা কে জানে? কারণ হরিপদ দাদার টাকা আছে সবাই জানে। ও আজ কাঁদতে কাঁদতে সে কথার কিছু আভাস দিলে। এই ব্যাপারের পর ওর সঙ্গে এই প্রথম আমি দেখা করলাম,—যতটা খারাপ লোকে ওকে মনে করে, আমি ততটা ভাবতে পারলাম না। তবে একটা কথা ঠিকই যে, সমাজের পক্ষে এই আদর্শটা বড় খারাপ। গ্রামের বাইরে গিয়ে যা খুশি কর বাপু, গ্রামের মধ্যে কেন? গৃহধর্মের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে লাভ কি?

আবার সজোরে বৃষ্টি এল।

তারপর বেলা পাঁচটা থেকে কি ভীষণ ঝড় উপস্থিত হল। গাছপালায় বেধে ক্রমবর্ধমান ঝটিকার সে কি ভীষণ শব্দ! আমি ভাবলাম যে রকম কাণ্ড, একটা সাইক্লোন না হয়ে আর যায় না। গতিক সেই রকমই দেখাতে লাগল বটে। সন্ধ্যার আগে এমন ভয়ানক বাড়ল যে আমি আর ঘরে থাকতে না পেরে বাঁশবনের পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম নদীর দিকে। দেখব ঝড়ের দৃশ্যটা। আমাদের বাড়ি যেতে বড় একটা বাঁশ পড়েচে—পাড়ার শ্যামাচরণ দাদাদের বাগানেও বাঁশ পড়েচে। গাছপালা, বাঁশবনে ঝড়ের কি শব্দ—আর সে কি দৃশ্য! প্রত্যেক গাছতলায় আম পড়ে তলায় বিছিয়ে আছে ঠিক যেন পিটুলি ফলের মত, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে আর এই ভয়ানক দুর্যোগ মাথায় জনপ্রাণী বাড়ির বার হয় নি। আমি যা পারলাম কুড়িয়ে নিলাম কিন্তু কোন পাত্র সঙ্গে আনি নি, আম রাখি কিসে? মাঠের মধ্যে নদীর ধারে গিয়ে আর অগ্রসর হতে পারি নে। যে-দিকে যাব, সে-দিক থেকেই ঝড় উড়িয়ে আনছে বৃষ্টির ধারা, ঠিক যেন বন্দুকের ছর্‌রার বেগে। ধোঁয়ার মত বৃষ্টির ঢেউ উড়ে চলেচে। গাছপালা মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়চে।

ঝড়ের শব্দে কান পাতা যায় না। সে দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করল। অনেকদিন প্রকৃতির এ রূপ দেখি নি, কেবল শান্ত সুন্দর রূপই দেখে আসচি।

তারপর মনে হল আমিই বা কম কি? এই ঝড়ের বেগ আমার নিজের মধ্যে আছে। আমি একদিন উড়ে যাব মুক্তপক্ষে ওই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জের পাশ দিয়ে, ওই বিষম ঝটিকা ঝঞ্ঝাকে তুচ্ছ করে ওদের চেয়েও বহুগুণ বেগে। আমি সামান্য হয়ে আছি—তাই সামান্য।

এই কথাটা যখন ভাবি, তখন আমার মধ্যে যেন কেমন একটা নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়। সে শক্তি কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, সেখানেই শেষ।

কাল সুপ্রভার চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়ে আজ সকালে বাগান-গাঁয়ে পিসিমার বাড়ি যাব বলে বেরিয়ে পড়েচি। আজ দিনটা সকাল থেকে মেঘ ও বৃষ্টি, পথ হাঁটার পক্ষে উপযুক্ত দিন, রোদ নেই, অথচ বৃষ্টি খুব বেশিও হচ্চে না। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া বইচে মাঝে মাঝে। কুঠীরমাঠে আসতেই আমাদের ঘাটের পথে শুয়োখালী আমগাছের অনেকগুলো আম পড়ল ঢুব্‌ঢাব্ করে। গোটাকতক আম কুড়িয়ে পথের ধারে বসেই খেলাম। কারণ যেতে হবে প্রায় তের—চৌদ্দ মাইল পথ, কখন গিয়ে পৌঁছুব তার নেই ঠিকানা। কুঠীর মাঠ দিয়ে, বৃষ্টি-ধোয়া বনঝোপের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে কি আনন্দই পেলাম। পথ হাঁটতে আমার বড় আনন্দ। এই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েচি। পথে পথে অনির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে চলেচি, এতেই আমার আনন্দ। কাঁচি-কাটার পুল পার হয়ে একটা লতা-ঝোপওয়ালা সুন্দর বাবলা গাছ ভেঙে পড়েচে রাস্তার ওপরে, এ রকম সুন্দর গাছ ভাঙলে আমার বড় কষ্ট হয়। বড় বড় বট, অশ্বত্থ গাছের ঘন ছায়া, পথের দু ধারে বুনো খেঁজুর গাছে কাঁদি কাঁদি স্বর্ণবর্ণ খেজুর দুলচে, 'বউকথা-কও' পাখি ডাকচে—বাংলা দেশের রূপ যদি কেউ দেখতে চায়, তবে এই সব গ্রাম্য পথে যেন প্রথম বর্ষার দিনে পায়ে হেঁটে বহুদূর গ্রামের উদ্দেশে যায়, তবেই সে বাংলাকে চিনবে, পাখি আর বনসম্পদ, তার পুষ্পরাজি, তার মেয়েদের দেখবে, ভালও বাসবে। আমি এই নেশাতেই প্রতি বৎসর এই সময় বেরিয়ে পড়ি।

বাগান-গাঁয়ের পথে বড় একটা বট গাছের তলায় বসে লিখচি। চারিধারে মাঠ, বৃষ্টি পড়চে ঝর্‌ঝর্ করে, বেলা কত হয়েচে মেঘে আন্দাজ করা যায় না, জোলো হাওয়ায় আউশের ভুঁই থেকে ধানের কচি জাওলার মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসচে, বট গাছের ডালে কত কি পাখি ডাকচে, মাঠের মধ্যে অসংখ্য খেজুর গাছ। চাষীরা ক্ষেতে নিড়েন দিচ্চে, তামাক খাচ্চে, নীল মেঘের কোলে বক উড়চে।

কাঁচিকাটা পুল পার হয়ে খানিকটা এসেই একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল। তার বয়েস ষাট-বাষট্টি হবে, রঙটা বেজায় কালো, হাতে একটা পোঁট্‌লা, কাঁধে ছাতি। আমি বললুম—কোথায় যাবে হে? সে বললে—আজ্ঞে দাদাবাবু, ষাঁড়াপোতা ঠাকুরতলা যাব। বাড়ি শান্তিপুর গোসাঁইপাড়া।

লোকটা বললে—একটা বিড়ি খান দাদাবাবু।

বেশ লোকটা। ও রকম লোক আমার ভাল লাগে। সহজ সরল মানুষ, এমন সব কথা বলে যা আমি সাধারণত শুনি নে।

সুন্দরপুরে আসতে প্রমথ ঘোষ সাইকেল চেপে কোথায় যাচ্চে দেখলুম। আমি আর আমার সঙ্গী দু-জনে মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে পার হই। সুন্দর মেঘাচ্ছন্ন সকালবেলা, নদীজল শান্ত, ওখানে সবুজ কষাড় বন। খেয়া পার হয়ে কেউটে পাড়া, মড়িঘাটা ছাড়িয়ে আমরা গোবরাপুর এলুম। আর বছর বাজারের যে দোকানে তামাক খেয়েছিলুম সেখানে আমরা তামাক খাবার জন্যে বসতে গিয়ে দেখি গোবরাপুরের জ্াববুর সেজছেলে মল্লিনাথ বসে আছে। সে আমাকে দেখে টানাটানি করতে লাগল তাদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। অন্তত চা খেয়েও যেন যাই। তার দাদা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, অনেকদিন পরে বাড়ি এসেচেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। তিনি নাকি আমার বই-এর খুব অনুরাগী ইত্যাদি বলে বাড়ি নিয়ে গেল। আমার সঙ্গীকেও সে নিমন্ত্রণ করলে। ওদের মস্ত বড়

বাড়ি, আর কত যে ছেলে মেয়ে! সব ভাইগুলি বড় চাকরি করে বিদেশে, এবার বাড়িতে ওদের সন্ন্যাসী ভাই এসে রামকৃষ্ণ-উৎসব করচেন সেই উপলক্ষে সবাই এসেচে। ওপরের ঘরে মেয়েরা গান গাইচে, বাইরের বৈঠকখানায় ছেলেরা তাস খেলচে—হৈ-হৈ কাণ্ড। আমরা চা-খাবার খেয়ে ভদ্রতা বজায় রাখার উপযুক্ত একটু গল্পগুজব করে তখনি আবার পথে বার হলুম। পথে বার হয়ে কোথাও একদণ্ডও থাকতে আমার ভাল লাগে না। আমার সঙ্গীটি যাবে পাশেরই গ্রামে তার জামাইবাড়িতে। ওরা আচার্য বামুন, এতক্ষণ নিজের মেয়ের ভাসুরের কথা বলতে বলতে আসছিল। সেই ব্যক্তিটি ঘরে খুব সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ছেলে না হওয়ার অজুহাতে, আজ দু-মাস হল পুনরায় দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেচে। সেই গল্প সে আমাকে নানাভাবেশোনাচ্ছিল। হঠাৎ জজ্‌বাবুদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই সে আমার ওপর অত্যন্ত ভক্তিমান হয়ে উঠল। জজ্‌বাবুদের বাড়িতে আমার আদর-যত্ন দেখেই বোধ হয় ওর মনের ভাবের এ পরিবর্তনটুকু হল। বললে, দাদাবাবু, আপনাকে এতক্ষণ চিনতে তো পারি নি। আপনি মাথা থেকে বের করে এমন একখানা বই লিখেচেন যার অত বড় দামী দামী লোকে এত সুখ্যাতি করলেন, তখন তো আপনি সাধারণ মানুষ নন!

সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় তার সুর গদগদ হয়ে উঠেচে, তারপর বললে, তবে বাবু যদি অনুমতি করেন, আমিও নিজের পরিচয়টা দিই। এতক্ষণ দিই নি, কারণ বিদেশে, পথেঘাটে, নিজের পরিচয় না দেওয়াই ভাল। দিয়ে কি হবে? আমার নাম নদে শান্তিপুর থেকে আরম্ভ করে কলকাতা পর্যন্ত সবাই জানে, আপনার শ্রীগুরুর চরণকৃপায়, হেঁ হেঁ। কৌতূহলের সহিত ওর মুখের দিকে চাইলুম। কোন্ ছদ্মবেশী মহাপুরুষের সঙ্গে এতক্ষণ আমার ভ্রমণ করবার সৌভাগ্য ঘটেচে না জানি!

লোকটা বললে—আমার নাম, দাদাবাবু, হাজারী পরটা।

আমি অবাক হয়ে বললুম—হাজারী—?

—আজ্ঞে, হাজারী পরটা।

—হাজারী পরটা?

—আজ্ঞে, সেই আমিই এই অধীন।

বলে সে আমার মুখের ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করবার জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বোধহয় আমার বিস্ময়কে পূর্ণ বিকাশের সময় দেওয়ার জন্যে। কিন্তু আমি তখনও সেই অবাক ভাবে চেয়ে আছি দেখে বললে, দাদাবাবু, যদিও আমরা ভট্‌চায্যি কিন্তু আমার উপাধি পরটা। মানে এমন পরটা আর কেউ তৈরি করতে পারতো না নদে-শান্তিপুরের মধ্যে। পাঁচ সের ওজনের একখানা খাস্তা পরটা—যেখানে ধরুন খসে আসবে। আমার দোকান ছিল গ্রাম চাঁদপাড়ায়, দৈনিক দশ-বারো টাকা বিক্রি, পরটা, লুচি, আলুর দম, ডিম, মাংস। আমার দোকানে যে একবার খেয়েচে দাদাবাবু, সে আপনাদের বাপ-মার আশীর্বাদে কখনো ভুলতো না। কলকাতা পর্যন্ত আমার নাম-ডাক। খ্যাঁদা মিত্তিরের বাড়ি রশুই করেচি এক হাতা-বেড়িতে পাঁচ বছর।

তার গল্প তখনও ভাল করে শেষ হয় নি, একজন ডেকে বললে,—এই যে, বেয়াই মশাই যে! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার। নমস্কার, নমস্কার।

হাজারী পরটা স্মিতহাস্যে বললে—নমস্কার। তা আপনারা তো খোঁজ করবেন না, মেয়েটা আছে পড়ে, বলি এই একবার—আচ্ছা দাদাবাবু, আসুন একটু পায়ের ধুলো নিই।

বলেই লোকটা ঝুঁকে পড়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বসলো। তারপর তার বেয়াই-এর দিকে চেয়ে বললে—দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েই বুঝেচি উনি মহৎ লোক। ওঁর সঙ্গে জজ্‌বাবুর বাড়িতে গিয়ে খাসা আম, উৎকৃষ্ট সন্দেশ, চা কত কি খেলাম। কি আদর সেখানে ওঁর। শুনেই তার বেয়াই আমায় বিনীত ভাবে অনুরোধ করতে লাগলো, সেখানে দুপুরে থাকবার জন্যে। ভাবলে, জজ্‌বাবুরা যখন খাতির করেচে, তখন আমিই কোন্ ডেপুটি কি

অন্ততপক্ষে একজন পুলিশের দারোগা না হব? আমি আমার অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিলাম। তারা সকলে যতক্ষণ আমাকে দেখতে পায়, আমার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এবং আমার সম্বন্ধে কি সব কথা বলাবলি করতে লাগলো।

আমি বেরিয়ে এসে মাঠে পড়লুম। দু-ধারে আউশ ধানের ক্ষেত। একটা বৃহৎ জিউলি গাছের তলায় যখন পৌঁছেচি, তখন জোর বৃষ্টি আসাতে গাছের নিচে বসলুম। মাটি ভিজে গিয়েচে, আর প্রকাণ্ড ডালগুলোর সর্বত্রই আঠার ঝুরি ঝুলছে—অথচ কাল সুপ্রভার চিঠি আঁটবার জন্যে বারাকপুরে একটু জিউলির আঠা খুঁজে পাই নি।

কি সুন্দর লাগছিল উন্মুক্ত মাঠের হাওয়া, দু-ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, বর্ষাস্নাত গাছপালার ঝোপঝাড়। একটা প্রকাণ্ড বটগাছ মাঠের মধ্যে, তার তলায় অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করলুম বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত। ট্যাঙ্‌রা সুন্দরপুর, কমলাপুর প্রভৃতি গ্রাম পার হয়ে একটা সুন্দর জলাশয়ের তীরে এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় কলের গান হচ্চে দেখে সেখানে গেলাম। অনেক গ্রাম্য লোক জড়ো হয়েচে। গ্রামবধূরা ওপারের ঘাট থেকে গান শুনচে। জন-দুই পথচলতি লোক কলের গান নিয়ে যেতে যেতে এখানে বটগাছের তলায় শ্রান্তি দূর করবার জন্যে বসে কল বাজাচ্চে। আমিও গিয়ে দুটো রেকর্ড বাজাতে বললুম। তারা আমায় খাতির করে বসালে, বিড়ি খেতে দিলে, রেকর্ডের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বললে,—বলুন বাবু, কোন্ গান আপনার পছন্দ!

সামনের জলাশয়টা শুনলাম জ্যাম্‌দার বাঁওড়ের আগড়। কি সুন্দর যে তার দৃশ্য সেই বটতলা থেকে! বাঁওড় অর্থাৎ মজা নদী। তার ওপারে যতদূর দৃষ্টি যায় বড় বড় নিবিড় বাঁশবন জলের ওপর ঝুঁকে পড়েচে—পদ্মফুল আর পদ্মপাতায় জল দেখা যায় না, আরও ওদিকে শেওলা দাম বেধে গিয়েচে। আমি গান শুনতে শুনতে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। মনে একটা অপূর্ব মুক্তির সুখ। বেলা সাড়ে দশটা কি এগারটা, কলকাতা হলে এতক্ষণ ছুটতে হত স্কুলে। রুটিন বাঁধা জীবন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে এই সুন্দর পল্লীগ্রামের পদ্মফুলে ভরা জলাশয়ের তীরে প্রাচীন বটতলায় বসে।

পিসিমার বাড়ি বেলা একটার সময় এসে পৌঁছে দেখি পিসিমা খেতে বসেচেন। আমিও স্নান করে এসে খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করলুম। পিসিমার ঘরটাতে কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ পাওয়া যায়। ১৩০০ সালের পরে আর এঘরে নতুন পাঁজি আসে নি (১৩০০ সালে পিসেমহাশয় মারা গিয়েছিলেন)। সেকালের গন্ধে, সেকালের আবহাওয়ায় ঘরটা ভর্তি। কড়ির আলনা, সেকালের কাঁথা, কড়ির চুব্‌ড়ি, কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক, গরুড় মূর্তি বসানো পেতলের ঘণ্টা, বেতের প্যাঁট্‌রা—যে সব জিনিস একালে কোনও বড়িতে দেখা যায় না। একখানা কাশীদাসী মহাভারত আছে ১২৭৬ সালে ছাপা। অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে সেই সব প্রাচীন দিনের বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিলাম, কত পুরোনো দিনের কথা মনে হয়...যেদিন মেনকা পিসিমা আমার বাল্যে বাবার ওপর রাগ করে এখানে চলে এসেছিলেন,...বাবা এসে একবার কথকতা করেছিলেন।

বিকেলে হাটতলায় এক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হল। ডাক্তারটি অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত। একটা বাঁশের মাচায় মলিন শয্যা, একখানা ভাঙা টেবিল, গোটা বিশ-পঁচিশ শিশি, অন্যদিকে আর একটা মাচাতে এক বস্তা তামাক। একটুখানি বসবার পরই তিনি নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। আজ চার মাস থেকে এখানে এক পয়সা রোজগার নেই। হাটখোলার মুজিবর মিঞার দোকানে চালডাল ধার নিয়ে আজ চার-পাঁচ মাস চলচে। এদিকে বাড়িতে মেয়ের বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল চৌঠা জ্যৈষ্ঠ। টাকা যোগাড় না করতে পারায় বিয়ে ওদিনে হয়নি। তারপর বললেন—দেখুন এখানে একঘর বামুন আছে, বেশ বড় গাঁতিদার, তাদের বাড়ির এক বৌ আজ চার মাস শয্যাগত, তা মশায় একবার ডাকে না! বলে ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়ে কি হবে, আমরা ফকির দেখাচ্চি।

হাটখোলার এক দোকানে এক মৌলবী সাহেব আমাদের ডাকাডাকি করলেন বলে গেলাম,—এখানকার মক্তবে তিনি নতুন মৌলবী হিসেবে এসেচেন। মাসে বারোটা টাকা পাবেন, হাটখোলাতে একটা মুসলমানদের দরগা ঘর

আছে, সেইখানেই আপাতত থাকবেন। তার মুখে মধুবাবু সাব-ইনস্পেক্টরের গল্প শুনলাম। মধুবাবু আমাদের কালে, আমরা যে পাঠশালায় পড়তাম, সেখানে গিয়ে আমায় একবার 'গ্রন্থ' বানান জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে ১৯০৫ সালের কথা হবে।

সন্ধ্যার পরেই বৃষ্টি এল। আমি হাটখোলা থেকে চলে এলাম। রাত্রে একটা গোয়ালার ছেলে অনেক গল্পগুজব করলে।

সকালে স্নান করে পিসিমার কাছে বিদায় নিয়ে পাটশিম্‌লে মোহিনী কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রওনা হলাম। আজ খুব রোদ উঠবে, আকাশ নীল, সকালের হাওয়ায় বিলের জল আর ধানের জাওলার গন্ধ। হাটখোলার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে মাঠের পথে হাঁটি। এদেশে যেখানে সেখানে আমগাছের তলায় পিটুলি ফলের মত দিব্যি বড় বড় রাঙা রাঙা আম তলা বিছিয়ে পড়ে রয়েচে, কেউ কুড়োয় না দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম—তোমাদের এখানে আম কুড়োয় না কেন? সে বললে—বাবু, এখানে একপয়সা আমের পণ বিক্রি হয়—এত আম এখানে! কে কত খাবে! পাটশিম্‌লে ঢুকতেই একপাশে একটা বড় বন, একটা উঁচু শিমুল গাছ বনের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—তার ডালে পাতা মুড়ে পিঁপড়ে বাসা বেঁধেছে। দৃশ্যটা দেখে আমার মনে হল, এই সব সত্যিকার বাংলার বনের দৃশ্য, ট্রপিক্যাল বনানীর দৃশ্য না দেখলে বাংলাকে চিনব কি করে? শহরের লোকের শহরেই জন্ম, শহরেই বিবাহ, শহরেই মৃত্যু—তারা সত্যিকার বাংলার রূপ কখনও দেখে? যে বাংলার মাটির বৈষ্ণব কবিতা, গ্রাম্য সঙ্গীত, ভাটিয়ালি গান, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, পাঁচালী, কবি—এরা সে বাংলাকে কখনও দেখলে না। যে বাংলার শিল্প কাঁথা, শীতলপাটী, মাদুর, কড়ির আল্‌না, কড়ির চুব্‌ড়ি, খাগ্‌ড়াই পিতল-কাঁসার জিনিস—সে বাংলাকে এরা কখনও জানলে না। অথচ সমস্ত জাতিটার যোগ রয়েচে যার সঙ্গে—আর সে কি গভীর যোগ রয়েচে, তা এই পল্লীপথে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আমি খুব ভাল বুঝতে পারচি।

পাট্‌শিম্‌লে ঢুকে একটা ক্ষুদে জাম গাছতলায় শিকড়ের গায়ে বসে এই কথা কটা লিখচি, চারিধারে পাট্‌শিম্‌লের বন। আমার মনে হয় সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে যদি কোথাও বন-জঙ্গল ও বাঁশবনকে যথেচ্ছ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হত—তবে এই ধরনের নিবিড়, দুর্ভেদ্য বনানীর সৃষ্টি হত দেশে। এর প্রকৃতি মালয় উপদ্বীপের বা সুমাত্রা, যবদ্বীপের ট্রপিক্যাল (Rain forest)-এর সমান না গেলেও বিহার সাঁওতাল পরগনা বা মধ্যভারতের অরণ্যের চেয়ে স্বতন্ত্র। ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্টের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে লতাজাতীয় উদ্ভিদের প্রাদুর্ভাবে। এত নানা আকারের লতার প্রাচুর্য শুধু উষ্ণমণ্ডলের বনানীর নিজস্ব সম্পদ। এই জন্যে এই সব বনের রূপ স্বতন্ত্র। এত বুশ আন্ডারগ্রোথ্ (Bush undergrowth)-ও নেই সিংভূম বা মধ্যভারতের বনে। অল্প জায়গার মধ্যে এত বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের সমাবেশও সে সব বনে নেই।

মোহিনী কাকাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে দেখছিলুম—সামনের বৃষ্টিবিধৌত বনপত্রসম্ভারের শোভা নির্মল নীল আকাশে, সেই আকাশ অনেকদিন পরে মেঘশূন্য, আশ্চর্য মরকত-শ্যাম পত্রপুঞ্জের ওপর ঝলমলে পরিপূর্ণ সূর্যালোক। চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে একটা তরুণ নারকোল বৃক্ষের শাখাপত্রের স্পন্দন বড় ভাল লাগচে। প্রাচীন কালের ছোট ইঁটের ভাঙা বাড়ি, ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপ, ছাদভাঙা পুজোর দালান পূর্বেকার সম্পন্ন গৃহস্থের বর্তমান শ্রীহীনতার সুপরিচিত চিহ্ন চারিদিকে।

দুপুরের একটু পরেই পাট্‌শিম্‌লে থেকে বার হই। দু'ধারে প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়, আর-বছরে দেখা সেই কালীবাড়ির বাঁশঝাড়টা। বাঁশ না কাটলে কি ভাবে বাড়তে পারে তা কালীবাড়ির বাঁশঝাড় না দেখলে বোঝা যাবে না। বাঁশের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এ বাঁশ কালীপুজোর দিন ভিন্ন এবং ঠাকুরের প্রয়োজন ভিন্ন কেউ কাটতে পারে না, এ গ্রামের এই রীতি। এ গ্রামেও সর্বত্রআমগাছের তলায় যথেষ্ট আম পড়ে আছে, কেউ কুড়োয় না।

মাঠে পড়লুম, অতি ভীষণ রৌদ্র আজ, তবু একটু হাওয়া আছে তাই ঠাণ্ডা। রাস্তায় এসে ছায়া পাওয়া গেল, কিন্তু দু'ধারে যেমনি জঙ্গল, তেমনি মশা। এক জায়গায় একটা লাল টুকটুকে আম কুড়ুতে একটুখানি দাঁড়িয়েচি, অমনি

মশাতে একেবারে ছেঁকে ধরেচে। সাঁড়াপোতার বাজার ছাড়িয়ে কল্যকার সঙ্গী সেই হাজারী পরটার বেয়াইবাড়ি গেলুম। হাজারী পরটা বাইরে বসে তামাক খাচ্ছিল, আমায় দেখে লাফিয়ে উঠল, 'আসুন দাদাবাবু, মহা সৌভাগ্য যে আপনি এলেন, এঃ, মুখ যে লাল হয়ে গিয়েচে রোদে—মুখ লাল হওয়ার যদিও আমার কোনো উপায় নেই, আমার কালো রং-এ) আসুন, বসুন।'

তারপর সে নিজেই একখানা পাখা নিয়ে এল ছুটে। বাতাস দিতে আরম্ভ করলে নিজেই, তার বেয়াইকে ডেকে নিয়ে এল, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে—মহা খাতির। অনেকক্ষণ—প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে বসে গল্প করে সেখান থেকে বার হই। ওরা আবার একটু জলযোগ করালে, কিছুতেই ছাড়লে না। আবার রাত্রেও থাকতে বললে। আমি অবিশ্যি তাদের সে অনুরোধ রাখতে পারলাম না। গোবরাপুরের বাজারের কাছে এসে দেখি মণীন্দ্র চাটুয্যে যাচ্ছেন। মণীন্দ্রবাবু প্রথমে আমায় চিনতে পারেন নি, নাম বলতে চিনতে পারলেন, বললেন—চল আমার বাড়ি। আমি বললুম—বাড়ি গিয়ে তো থাকতে পারব না, সুতরাং গিয়ে কোন লাভ নেই। আপনি কেমন আছেন, বলুন। তারপর দু-জনে পথে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। মণীন্দ্রবাবু এ অঞ্চলের মধ্যে একজন মানুষের মত মানুষ। অমন উদারহৃদয় পরোপকারী, সদাশয় বৃদ্ধ এ সব দেশে নেই। আমি ওঁর কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। সে কথা এখানে আর ওঠাতে চাই নে। তিনিও সে বিষয়ে কোন উল্লেখ করলেন না। বললুম, শনিবারে আসতেই হবে আমাদের এখানে উপেন ভট্চাজের মেয়ের বিয়েতে, সেদিন আবার কথাবার্তা হবে। আজ আসি।

আর কোথাও দাঁড়ালুম না। সূর্য হেলে পড়েছে। রোদ নিস্তেজ হয়ে আসচে। আমায় যেতে হবে এখনও সাত মাইল পথ।

কেউটে পাড়ার পথে এক বুড়ী জিজ্ঞেস করলে—বাবু, এত রোদে বেরিয়েচ কেন?

বললুম—যাব অনেকদূর পথ।

বুড়ীটি টিকে বেচতে যাচ্ছে গোবরাপুরের বাজারে। মোল্লাহাটির খেয়া যখন পার হই, তখন সূর্য হেলে পড়েচে। মোল্লাহাটির হাট বসেচে, আজ আর-বছরের মত হাটে গেলুম। খুব আমের আমদানি। বেলা গিয়েচে দেখে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। মোল্লাহাটি থেকে খারাপোতা পর্যন্ত আসতে রোদটুকু একেবারেই গেল। কিন্তু পথের পাশের আরামডাঙার খড়ের মাঠের দৃশ্য দেখে মনে হল, আমাদের অঞ্চলটি সুন্দর বেশি। এত নদী বাঁওড়ের সমাবেশ অন্যত্র নেই।

আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ির পিছনে সেই বাঁকে এসে খানিকটা বসে বিশ্রাম করি। এই জায়গাটা বড় ভাল লাগে আমার। মরাগাঙ্ চক্রবৃত্তে ঘুরে গিয়েচে, বাঁশবনের শীর্ষ অপরাহ্ণের ছায়ায় আর নীল আকাশের তলায় বেশ দেখাচ্চে। পুল পার হয়ে এসে দেখি গঙ্গাচরণের দোকানে তালা, দোকান নাকি উঠে গিয়েচে স্টেশনে ধারে। কুঠীর মাঠের পথ দিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি পৌঁছই। খুদুরা আসে নি, আসবার কথা ছিল কাল। ঊষার চিঠি এসেচে, দেখি খাটের ওপরে পড়ে আছে। চার বছর পরে ওর খবর পেলাম।

আবার বৃষ্টি নামল, খুব ঠাণ্ডা পড়ল—কিন্তু কি জানি সারারাত আমার ভাল ঘুম হল না। শেষরাত্রের দিকে একটু ঘুম এল।

এসেই ঊষার চিঠি পেলুম, আর একখানা হাওড়ার রমেন ভট্টাচার্যের। তার পত্রখানার উত্তর দিতে হবে। ঊষা এসেচে কলকাতায় বহুদিন পরে, এর মধ্যে একদিন গিয়ে দেখা করতে হবে।

একটা শিমুল গাছের গুঁড়িতে বসে কত কথা ভাবলুম। বাল্যে ওই সব বাদলার দিনে কেমন নৌকো বেয়ে একা বেড়াতুম, ওদিকে চাল্‌তেপোতার বাঁক চট্‌কাতলার খালের নাম রেখেছিলুম 0ysterbrook (অস্টারব্রুক)—তখন সমুদ্রভ্রমণের নানা বই পড়তুম, সর্বদা সেই স্বপ্ন দেখতুম। সেই সমুদ্র ও আমাদের এই ছোট্ট ইছামতী, তার জল একই কালো জল। সন্ধ্যায় একটা তারা উঠল মাধবপুরের নির্জন চরের একটা অতি সুন্দর তরুণ সাঁইবাবলা গাছের মাথায়। কত অদ্ভুত চিন্তা মনে আসে তারাটার দিকে চেয়ে!

বড় ভাল লাগে এই দূরবিসর্পিত আউস ধানের ক্ষেত, বাঁশঝাড়ের সারি—বসে বসে এই সুখদুঃখময় ভাবনা। কলকাতায় ফিরে এসব দিনের কথা বড় মনে হবে। এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি আছে, কলকাতায় মন থেকে উপবাসী প্রকৃতির উপভোগের দিক থেকে, এখানে দুদিন এসে বাঁচি।

তবুও তো এবার রোদ না ওঠার জন্যে ছুটির শেষের দিকটা মন বড় ভাল নয়। নীল আকাশ দেখা এবার ভাগ্যে বড় একটা জুটবে না।

মুসলমান মাস্টারটি এল। দু-জনে গিয়ে পাঠশালার পেছনে মরাগাঙের ধারে বসব, এমন সময়ে এল ঝোড়ো কালো মেঘের রাশি, বারাকপুরের দিক থেকে উড়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষার বৃষ্টি।

দৌড়, দৌড়, সবাই মিলে ছুটে গিয়ে পাঠশালার ঘরে আশ্রয় নিলুম। সেখানে বসে ও অম্বিকাপুরের মিটিং-এর কথা বলতে লাগল, আমায় সেখানে নিয়ে যেতে চায় তারা—কবে আমার যাবার সুবিধে হবে ইত্যাদি।

আধঘণ্টা পরে থামল বৃষ্টি। দু-জনে গিয়ে বসলুম পাঠশালার পেছনে মাঠে মরাগাঙের ধারে, আরামডাঙার চরের এধারে।

মুসলমান মাস্টারটির বাড়ি বরিশাল জেলা। অনেকদিন থেকে সে এদেশে আছে। তার খেয়াল গ্রামে গ্রামে চাষাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা। অম্বিকাপুর, মামুদপুর, শচীনন্দপুর, মহৎপুর, হুদো, মানিককোল, বউজুড়ি, সর্পরাজপুর—এসব গাঁয়ে সে পাঠশালা বসিয়েচে, নিজে দেখাশুনো করে, চাষামহলে তার খুব খাতির। নিঃস্বার্থ সেবাব্রতে ব্রতী উদার ধরনের যুবক। তাই ওকে বড় ভাল লাগে। বললে—আসুন, বেশ জায়গাটা, বসে একটু গল্প করি। বিড়ি নেই পকেটে—মুশকিল হয়েচে, কাকে দিয়ে আনাই বলুন তো!

আমি গামছা পাতলাম বৃষ্টিসিক্ত কচি ভেদ্‌লা ঘাসের ওপর। ওকে বললুম—বসুন।

ও বললে—আপনার গামছায় বসব? জোর করে তাকে বসালুম।

তারপর সে একটা গল্প ফাঁদলে।

বললে—শুনুন, সেদিন অম্বিকাপুরে একটা বড় করুণ ব্যাপার হয়ে গিয়েচে। অম্বিকাপুরে আমার যে পাঠশালা আছে, সেখানে একটি মুসলমান মেয়ে পড়ত, তার নাম মোমেনা, ও বছর উচ্চ-প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাস করেচে। চাষার মেয়ে, কিন্তু চাষার ঘরে অমন রূপ কেউ দেখে নি। এই টক্‌টকে গায়ের রং, এই পটল-চেরা চোখ, এই স্বাস্থ্য, এই গড়ন—সবদিক থেকে মেয়েটি যেন আপনাদের বামুন-কায়স্থের ঘরের সুন্দরী মেয়ের মত। তার ওপর তার লেখাপড়ায় খুব ঝোঁক, গান জানে, শিল্পকাজ শিখেচে স্কুলে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মেয়েটির এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সেই বছরেই বিধবা হয়। উচ্চ-প্রাইমারী পরীক্ষা দেবার পর যখন পাসের খবর বেরুল, তখন তার দেওর তার বাপ-মা'র কাছে যাতায়াত শুরু করলে তাকে বিয়ে করবার জন্যে। মেয়েটির বাপ-মা রাজী হয়ে গেল। কিন্তু মেয়ের তাতে ঘোর আপত্তি। তার দেওর নিতান্ত মূর্খ চাষা। স্বাস্থ্য অতি খারাপ, চেহারা কালো। মেয়েটি ওই গ্রামেরই একটি ছেলেকে ভালবাসে, মুসলমানেরই ছেলে, থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল রাণাঘাট স্কুলে, এখনও বাড়িতে বই, খবরের কাগজ আনিয়ে পড়ে। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, সুশ্রীও বটে, মেয়েটির বয়েস সতেরো। মেয়ে বাপ-মাকে নাকি গোপনে বলেছিল,—যদি তোমরা আমার বিয়ে দিতেই চাও, তবে অমুকের সঙ্গে দিও, আমার দেওরকে আমি বিয়ে করব না।

বাপ-মা তাতে ঘোর গররাজি। দেওরদের নাকি খুব ধানের গোলা আছে, ক্ষেতখামার আছে, এ ছোকরার কিছু নেই।

মেয়েটির কথা কেউই শুনলে না। তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে তার দেওরের সঙ্গে। বিয়ের সময় আমাদের মুসলমানদের প্রথা আছে বিবিকে মোল্লা জিজ্ঞেস করবে, তুমি একে বিয়ে করতে সম্মত আছ তো?

মোল্লা সে কথা মেয়েকে জিজ্ঞেস করতেই মেয়ের ফিট্‌ হয়ে গেল সেই বিয়ের আসরে।

ভাবুন, কতটা দুঃখ সে বুকে চেপে রেখেছিল নীরবে মুখ বুজে!

আমি বললুম—বিয়ের কি হল?

সে বললে—বিয়ে কি আটকে আছে? হয়ে গেল। তারা শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গেল।—বড় লক্ষ্মী মেয়ে, কিন্তু তার জীবনটা—

The usual story—অনেক শুনেচি এমন ধরনের গল্প। কিন্তু কেন এমন হয়, তা কেজানে?

সূর্য অস্ত যাচ্চে। বাবুই পাখিদের অত্যাচার বড় বেড়ে গিয়েচে। জোলো ধানের ক্ষেতে বেজায় পটপটির আওয়াজ ও ভাঙা টিনের বাজনা। ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের আকাশে যেন একটা কালো আভা লেগেচে।

অমন সুন্দর স্থান, অমন মরাগাঙের ধারে, আরামডাঙার চরের এপারে, অমন ইন্দ্রনীল আকাশের নীচে বসে গল্পটা বড়ই করুণ লাগল।

হয়ত গল্পটা কিছু নয়—মানুষের ব্যথাহত আত্মার আকুতি—সেটাই আসল জিনিস। আইভ্যান বুনিনের কথায় বলি :—

'Then what is Art ? It is the prayer, the music, the song of the human soul'—এই কথাটা আমাদের দেশের পণ্ডিতম্মন্য সমালোচকদের বুঝতে দেরি লাগবে। শুধু teller of tales হওয়া আর প্রাণের ভাষার ব্যঞ্জনা—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, আমাদের অনেকে বলে—গল্প তো বলা হয়ে গেল, আর কেন, পাঠকে বুঝে নিক না বাকিটুকু।... পাঠকে বুঝবে কাঁকুড়!

রোজই যখন হাট করে ফিরি, তখন আমার চোখে পড়ে বটগাছ, বাঁশবন, আমগাছ, বড় বড় কুকুরে-আলুর লতা গাছের গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে। পানের মত তার চক্‌চকে সবুজ পাতা, গাছে কাঁঠাল ঝুলচে, নারকেল গাছ, কলাগাছ, পেঁপে গাছ; ঘন আগাছার জঙ্গল, বাঁওড়েরচর, কচুরিপানার দাম, কোকিল ও "বৌ-কথা-কও" পাখির ডাক, কুঁচ ঝোপ, শিমুল গাছ, সোনালী-ফুল-দোলানো বাবলাগাছ, উলঙ্গ শিশুর দল, মাছ-ধরা দেয়াড়ী, কুমোরপাড়ায় হাঁড়ি পোড়াবার পন, কলসী কাখে গ্রামবধূর দল—ট্রপিক্‌সের কোনও একটা দেশের পরিচিত দৃশ্য। যেমন দেখা যায় যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, মালয় উপদ্বীপে, বোর্নিও ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এদের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, শিল্প, খাদ্য, পরিচ্ছদ, দেশের দৃশ্য। আমরা বলি আমাদের ভাল; ওরা বলে ওদের ভাল। ওদের বিজ্ঞান আছে, কলকব্জা আছে, সাহস আছে, অধ্যবসায় আছে—আমাদের দর্শন আছে, প্রাচীন ঋষিরা আছেন, পাঁজিপুঁথি বিস্তর আছে...আমরা বলি আমরাই বা কম কি?

আমি তো দেখি এসব কিছুই নয়। এবার ট্রপিক্‌সের কোনও দেশে (যদিও বাংলা ওর মধ্যে পড়ে না) জন্মেচি, দূর কোনও জন্মান্তরে যাব ইউরোপে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা বৃহস্পতি কি অন্য কোনও গ্রহান্তরে, কি কোন্ দূর নক্ষত্রে—আমি অমর আম্মা, আমি দেশকালের অতীত— কোন্ দেশ আমার, কোন্ দেশ পর? সকলকেই ভালবাসতে চাই স্বদেশ বিদেশ নির্বিশেষে, সকলের সব ভালটুকু নিতে চাই—এই আমার, এই তোমার—এ সঙ্কীর্ণতা যেন থাকে না। এই দেশে জন্মেচি, মানুষ হয়েছি, কিন্তু এদেশের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মিশিয়ে দিলেও যেন খানিকটা আছি কৌতূহলী দর্শকের মত, যেন এই বৃক্ষলতাবহুল সবুজ দেশে এসে দেখে এবার আশ্চর্য হয়ে গেছি, এতদিন দেখচি আজ চল্লিশ বছর ধরে, তবু তৃপ্তি নেই, এ নিত্য নতুন আমার কাছে, কোনও দিন বুঝি এর রূপ একঘেয়ে লাগবে না।

সাতবেড়ের একটি ছেলে গল্প ও কবিতা লিখে মাঝে মাঝে আমার হাতে দেয়। গত দু-তিন বছর থেকে দিচ্ছে। গরিবের ছেলে, পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারেনি, কিন্তু লেখে মন্দ নয়। গল্পের হাত আছে, তবে টেক্‌নিকের ওপর তেমন দখল নেই, থাকবার কথাও নয়—টেক্‌নিক জিনিসটা কতকটা আসে এমনি, কতকটা

আসে ভাল লেখকদের গল্পের রচনারীতি দেখে। তার জন্যে পড়াশুনোর দরকার হয়। এ ছেলেটির সেরূপ বই পড়বার সুযোগ কোথায়?

মুচি-বাড়ির সামনে বটতলায় তার সঙ্গে দেখা। সে আমার সঙ্গে আলাপ করবে বলেই ওখানে বসে অপেক্ষা করছিল, বললে। কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে—আর বছরের সেই লেখাগুলো কি দেখেছিলেন?

ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় বছরে একবার, এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটিতে। সেই সময় ও আমার কাছে ওর লেখা দেয়, ইচ্ছেটা এই যে কলকাতার কোনও কাগজে ছাপিয়ে দেবো। কিন্তু কাগজে ছাপাবার উপযুক্ত হয় না ওর লেখা। তবুও আমি প্রতি বৎসর উৎসাহ দিই, এবারও দিলাম। মিথ্যে করে বললুম, তোমার গল্প বেশ ভাল হয়েছিল, কলকাতার অনেকে পড়ে খুব সুখ্যাতি করেচে। ও আগ্রহের সঙ্গে বললে—কোন্ গল্পটা? আমার নাম মনে নেই ওর কোনও গল্পেরই, কাগজগুলোও কোন্ কালে কোথায় হারিয়ে গিয়েচে। ভেবেচিন্তে বললুম—সেই যে একটা মেয়ে; বলতেই ও তাড়াতাড়ি বললে—ও বিয়ের কনে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও বিয়ের কনে।

একটা মিথ্যে কথা পাঁচটা মিথ্যে কথা এনে ফেলে। কাঁচিকাটার পুল পর্যন্ত বটতলার ছায়ায় ছায়ায় ও আমার সঙ্গে সঙ্গে অতীব আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে শুনতে শুনতে এল, কলকাতার কোন্ কোন্ বড় লোক ওর গল্পের কি রকম সুখ্যাতি করেচে—কোন্ কাগজের সম্পাদক বলেচে যে, আর একটু ভাল লেখা হলেই তারা তাদের কাগজে ছাপাবে, তার কবিতা পড়ে কোন্ মেয়ের খুব ভাল লেগেছিল বলে হাতের লেখা কবিতাটা আমার কাছে থেকে চেয়ে নিয়ে রেখে দিয়েচে কাছে। সন্ধ্যার দেরি নেই, আমি বললুম—তবে আজ যাই, আবার ফিরে নদীর ধারে মাঠে বেড়াতে যাবো। কি করো আজকাল! ও বললে—বাড়ি বসে তো আর চলে না, তাই ওই পথের ধারে ধানচালের আড়তে কাজ নিইচি। আজ এই তিন মাস কাজ করচি।সকালে আসি আর সন্দের সময় ছুটি পাই।

তারপর একটু লজ্জামিশ্রিত সঙ্কোচের সঙ্গে বললে—আসচে হাটে আপনাকে আর গোটাকয়েক গল্প ও কবিতা দেবো—পড়ে দেখবেন কেমন হয়েচে। কলকাতার ওই বাবুদেরও দেখাবেন। আমি উৎসাহের সঙ্গে বলি—নিশ্চয়ই। বাঃ, চমৎকার লেখা তোমার! পড়ে সেখানে সবাই কি খুশি! তা এনো। আসচে হাটবারেই এনো। তার আর কথা কি!

ও বললে—ফিরবেন তো এমন সময় ? আমি লেখা নিয়ে এই বটতলায় বসে থাকবো। আসবেন একটু সকাল-সকাল যদি পারেন—দু-একটা লেখা একটু পড়ে শোনাবার ইচ্ছে—

আমি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম—শোনাবে নাকি? বাঃ, তবে তো বেশ দিনটা কাটবে। নিশ্চয়ই আসবো। তোমার কথা কত হয় কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে।

বেচারীকে সত্যি কথা বলে লাভ নেই। ওতেই ওর সুখ, আমরা সবাই জীবনে মিথ্যের স্বর্গ রচনা করে রেখেচি, উনিশ না হয় বিশ। মিথ্যে বলে যদি ওই দরিদ্র, অসহায় পল্লীযুবককে এতটুকু আনন্দ দিতে পারি, ভালই। ওর মিথ্যে স্বর্গ আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত অক্ষয় হোক্।

আজ ঘুম থেকে উঠে যখন হাটে যাই, তখন মেঘলা করে এসেচে, বেশ লাগলো। বনে বনে কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ফলে আছে, পানপাতার মত বড় বড় লতা উঠেচে গাছে গাছে—ঘন কালো বর্ষার মেঘ করেচে নৈঋত কোণে। গোপালনগর পৌঁছতেই রাধাবল্লভ নিয়ে গেল ওদের বাড়ি। রাধাবল্লভের স্ত্রী পাঁচী আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেচি বকুলতলায় —বিলবিলের ধারে, যুগল বোষ্টমের কামরাঙাতলার পথে। ওরা জাতে জেলে। ওর বিয়ের পর ওকে আমি এই প্রথম দেখলুম বোধ হয় বাইশ-তেইশ বছর পরে। দেখে বড় স্নেহ হল—গড় হয়ে এসে প্রণাম করল। কথাবার্তা খুব বিনীত, নম্রসম্র। একটু ভয়ে ভয়ে কথা বললে।

আমি ব্রাহ্মণ, ওর বাড়িতে গিয়েচি, পাছে আমার কোনও অসম্মান হয়, এই ভয়েই তটস্থ। ওর ছেলেকে দিয়ে একটু সন্দেশ ও জল পাঠিয়ে দিলে। তাও ভয়ে ভয়ে। ভাবলে আমি খাবো কিনা। নিজের হাতে সাহস করে নিয়ে আসতে পারলে না। আমি ওকে দেখিয়ে সে সন্দেশও জল খেলুম, ওর মনে দ্বিধা ও সঙ্কোচের কোনও অবকাশ দিলুম না।

ও পড়ে গিয়েচে বড় বিপদে। ওর বড় মেয়ের বয়স প্রায় কুড়ি। মেয়েটি দেখতে শুনতে বড় ভাল, লেখাপড়াও শিখেচে। ওদের জাতে ভাল ছেলে বড় একটা পাওয়া যায় না—অনেক খুঁজেপেতে বাপে বিয়ে দিয়েছিল ওরই মধ্যে একটু আধটু শিক্ষিত একটি ছেলের সঙ্গে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে ওর ওপর বড় খারাপ ব্যবহার করে বলে বাপ মেয়েকে আর সেখানে পাঠাতে চায় না। সে জামাই আবার বিয়ে করচে। এই সব নিয়ে গোলমাল। ওরা জেলেপাড়ার মধ্যে বাস করে, ভাল কোঠাবাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। ওর স্বজাতিরা সেজন্যে ওদের দু-চোখ পেড়ে দেখতে পারে না। তার ওপর মেয়েটা নাকি সর্বদা বই পড়ে। কি সর্বনাশ! জেলের মেয়ে বই পড়বে কি? ওদের পাড়ার লোক ষড়যন্ত্র করে একরাত্রে ওদের ঘরে ঢুকে কিছু টাকা কাপড়চোপড় চুরি করে নিয়ে গিয়েচে, আর এক বাক্স ভাল ভাল বই সব ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েচে।

পাঁচী লেখাপড়া জানে না, কিন্তু বইগুলোর শোক ওর লেগেচে খুব। আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আসুন তো দাদা, দেখুন দিকি, আপনি তো লেখাপড়া জানেন, আমার এক বাক্স বই, খুড়শ্বশুরের কেনা—বইগুলো ছিঁড়ে খুড়ে তার আর কিছু রেখেচে দাদা?

গিয়ে দেখলুম একটা আমকাঠের সিন্দুকে অনেকগুলো পুরোনো বই, বেশ ভাল বাঁধানো। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কিছু সেকেলে বাজে বটতলার উপন্যাস, মডেলভগিনী; কঙ্কাবতী, পুরোহিত দর্পণ (ওদের বাড়ি পুরোহিত দর্পণে কি কাজ জানি নে), রামায়ণ, হরিবংশ এইসব বই। মেয়েটা সেই সব বই পড়তো বলে পাড়ার কারও সহ্য হতো না। তাই বইগুলোর ওপরে ঝাল ঝেড়েচে।

আমি বললুম—যদি ওকে শ্বশুরবাড়ি না পাঠাও, তবে ওর লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করো।

পাঁচীর কান্না দেখে বড় কষ্ট হল। কতকাল আগে বাল্যে একসঙ্গে খেলা করেচি, ওদের পর ভাবতে পারি নে।

হাট থেকে যখন ফিরি, তখন বেলা গিয়েচে, রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। মাঠে নদীর ধারে একটু বসে ওপারের মেঘস্তূপ লক্ষ্য করি, তারপর জলে নামি স্নান করতে। অন্ধকার হয়ে গিয়েচে, ওপারের চরে সাঁইবাবলা গাছের বন, আর সেই প্রতিদিনের উজ্জ্বল তারাটি উঠেচে, দেখতে বড় চমৎকার হয় ওই তারাটা।

সকালে বসে যখন লিখচি, মনোরমা এসে বই চাইলে—পাঁচীর মেয়ে মনোরমা। ও আমার কাছে একখানা বই চেয়েছিল এবার, কিন্তু নানা গোলমালে সুবিধে হয় নি। বললুম, কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেবো, মা।

বেশ মেয়েটি মনোরমা, জেলের মেয়ে বলে ওকে বোঝাই যায় না।

ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাবার সময় নড়াইল থেকে একখানা নৌকা আসচে দেখি, যাবে গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরতে, দু-দিন হল ইছামতী নদীতে পড়েচে। তারা জিজ্ঞেস করলে— ইছামতীর মুখ আর কত দূরে?

ঘাটের কেউ জানে না। আমি বললুম—আরও দুদিন লাগবে চূর্ণী নদীতে পড়তে। সেখান থেকে আর একদিন।

বৈকালে বেলেডাঙার পল্লীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করলুম। আরামডাঙা, নতিডাঙা, সদানন্দপুর, চিত্রাঙ্গপুর, নতুনপাড়া, পাঁচপোতা প্রভৃতি সাত-আটখানা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছিল। সদানন্দপুরের সৈয়দ আলি মোল্লাকে সভাপতি করে আমি এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লাম সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। ছেলেরা গান গাইলে, ফুলের মালা গলায় দিলে। হৈ-হৈ ব্যাপার। তারপর উপস্থিত লোকেদের মধ্যে বেছে বেছে এক কার্যকরী সমিতি গঠন করি। নূর মহম্মদ মাস্টারের আগ্রহেই সব হল। সে লোকটা নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ, গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোক যোগাড় করা, সকলকে

খবর দেওয়া, এসব সে-ই করেচে। মিটিং-এর পরে বৈকালে নীল আকাশের বিচিত্রবর্ণ মেঘস্তূপের তলে মরাগাঙের ধারে সবুজ ঘাসভরা মাঠের মধ্যে বসে গ্রামের লোক কত দুঃখের কথা আমার কাছে বলতে লাগল। গাঁয়ে জলের কষ্ট, কচুরিপানায় পচা জল খাচ্ছে, বেলে জমিতে ফসল হয় না, ক-বছর অজন্মা, মোল্লাহাটির খেয়াঘাটের ঘাটওয়ালাদের জুলুম।

তাদের বুঝিয়ে দিলাম, এই পল্লীমঙ্গল সমিতি থেকে গ্রামে এসব অভাব অভিযোগ দূর করবার চেষ্টা করা হবে। তোমরা চাইতে জানো না, তাই পাও না। অন্য গাঁয়ে দুটো টিউবওয়েল হয় দু-পাড়ায়, তোমাদের গোটা গাঁয়ে একটাও হয় না।

সন্ধ্যার আগে সেখান থেকে রওনা হলুম যখন, তখন মাথায় সেই উজ্জ্বল তারাটি উঠেছে। বাড়ি এসেই ঊষার পত্র পেলুম।

ছুটি শেষ হয়ে আসচে আর আমার মন খারাপ হয়ে আসচে। এই মুক্ত নদীর চর, নীল উদার আকাশ, বর্ষাশ্যাম তৃণভূমি, আষাঢ়ের টলটলে কালো জল ইছামতীর, জোনাকির ঝাঁক, 'বৌ-কথা-কও' পাখির ডাক, এসব ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়।

জীবনের বেগ যেন মন্দীভূত না হয়। আমাদের দেশে, আমাদের জাতীয় জীবনে তার আশঙ্কা খুব বেশি। পেট্রার্ক সম্বন্ধে যেমন উক্ত হয়েচে—it is a Noble Florentine profile, the whole aspect suggesting abundance of thought and life...'

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কার সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় ?

রাত্রে মানু রায়ের বাড়িতে সামাজিক দলাদলির মিটিং হল রাত একটা পর্যন্ত। গাঁয়ের সবাই ছিল, কিছুতেই আর মেটে না। নানা কথা ওঠে, এ রাগ করে চলে যায়, ও রাগ করে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত কিছু মীমাংসা হল না। আমায় দু-বার ডাকতে এল, আমি যাই নি।

সারাদিন বর্ষার বৃষ্টি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পথেঘাটে জল বেধেছে। বৈকালে বৃষ্টি একটু ধরেছিল, সন্ধ্যায় আবার মেঘ এল ঘনিয়ে। আমি সেই সময় নদীর জলে নেমেচি নাইতে—মাধবপুরের পারের ওপরে সেই মেঘনীল দিগ্বলয়ের পটভূমিতে একটি শিমুল গাছ কি সুন্দর দেখাচ্চে। এই ইছামতী, এই মেঘমালা, এই বর্ষার সবুজ বনভূমি এমনি থাকবে—অথচ আমরা চলে যাবো আমাদের সকল সুখ-দুঃখ নিয়ে, আজকের এই মেঘমেদুর সন্ধ্যার সকল অনুভূতি নিয়ে। ঘাটের ওপর ওই বনসিমলতার কোলের নিচে খুকুর সে ছবিটা ক্রমে বহুদূরের হয়ে পড়েচে, এই পল্লীনদীটির শ্যামতীরে বাঁশ ও বনসিমলতার ছায়ায় অক্ষয় হয়ে থাকবে সে ছবি, এর আকাশে বাতাসে মিলিয়ে, কিন্তু তাকে চিনে নেবার লোক থাকবে না কেউ, কেউ এমন থাকবে না যার মনে ও-ছবি বেঁচে থাকবে।

বারাসাত গেলুম পশুপতিবাবুর কাছে। উনি সকালেই যেতে লিখেছিলেন। কিন্তু শরীরটা একটু খারাপ ছিল। বারাসাত নেমে দেখি এ অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে—অথচ কলকাতায় এক ফোঁটাও জল নেই। হাসপাতালে গিয়ে দেখি পশুপতিবাবু জেল দেখতে গিয়েছেন। আমি বসে বইলুম, তারপর পশুপতিবাবু এলেন। আমায় পেয়ে খুব খুশি। দু'জনে হাসপাতাল দেখতে গেলুম, গোবরডাঙা থেকে এসেচে একটা জখম রোগী। তার মাথায় দু-তিনটে বড় বড় গর্ত। তার বড় ভাই নাকি বিষয়ের ভাগ দিতে হবে বলে তার মাথায় ওই রকম মেরেচে। পশুপতিবাবু বললেন, লোকটা বাঁচবে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ, গাঙ্গুলি, গোবরডাঙার কাছে বেড়গুমি গ্রামে বাড়ি। হাসপাতালের কালো, মোটা মত একটা নার্স ওকে যত্ন করচে দেখলুম।

তারপর জেল দেখতে গেলুম। তখন কয়েদীরা খেতে বসেচে। খাবার বন্দোবস্ত দেখে মনে হল জেলের মধ্যে ওরা বেশ সুখেই থাকে। দিব্যি সাদা চালের ভাত, তরকারিটা রেঁধেছে তার বেশ সদ্‌গন্ধ বেরুচ্ছে, ডালটাও বেশ ঘন। সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংস দেয়। ওরা নিজেদের বাড়িতে অমন খাদ্য প্রতিদিন তো দূরের কথা

কালেভদ্রে খেতে পায় কিনা সন্দেহ। একজন কয়েদী ভদ্রলোকশ্রেণীর, তাকে বললুম, আপনার কি হয়েছিল, কতদিনের জেল ? বললে, চিটিং কেস মশাই। পনেরো মাসের জেল। আর একটা ছোকরাকে বসিরহাট অঞ্চল থেকে ধরে এনেচে। তার বিচার এখনও হয় নি। জিজ্ঞেস করলুম—কি করেছিলে?

বললে—একটা মেয়েকে খুন করেচি।

—কেন খুন করলে?

—বাবু, চারদিন খাইনি। ওর গায়ে গয়না ছিল, সেই লোভে মেরেচি।

আমরা বললুম—বাপু, ওরকম বোলো না, পুলিশের কাছেও না, বিচারের সময়ও না। বললে মারা পড়বে।

তারপর এসে একটা বড় পুকুরের ধারে বসলুম। তখন বৃষ্টি থেমে গিয়েচে। পুকুরের ওপারের আকাশে মেঘপুঞ্জ, তবে কি আর দেশের মত ভাল লাগছিল, তা নয়। কলকাতার চেয়ে ভাল বটে। একটা ছোট মেয়ে, পশুপতিবাবু বলাতে অনেকগুলো জুঁই ফুল তুলে এনে দিলে। পশুপতিবাবুর বাসায় বারান্দাতে বসে চা খেয়ে অনেক গল্প করা গেল।

রাত্রে ফিরবার সময় মিনুদের বাড়িটা দেখলুম। বাড়িটা ভালই, তবে বারাসাতে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া বলে ওঁরা এখানে থাকতে পারেন না।

আজ রাধাকান্তদের বাড়ি গেলুম তার বৌভাতের নেমন্তন্নে। অনেকদিন যাই নি ওদের বাড়ি, ওরাও খুব ভালবাসে। বাইরের ঘরে খুব ভিড় থাকা সত্ত্বেও রাধাকান্ত, ঘিচু, ভীম, বাঁটুল সবাই এসে গল্পগুজব ও আপ্যায়িত করলে। ভীম ও বাঁটুলের সে কি আনন্দ আমি গিয়েচি বলে! রাধাকান্ত খাবার সময়ে হাত ধরে ওপারে নিয়ে গেল ওর বোন লক্ষ্মীর কাছে। লক্ষ্মীকে বললে—এঁকে আলাদা জায়গা করে খেতে দে। লক্ষ্মীর ছোট বোনটা বেশ বড় হয়ে উঠেচে দেখলুম। আমি একবার পুজোর সময় জাহ্নবীর মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলুম, ওর আগের পক্ষের খুড়ীমা তাকে পুতুল দিয়েছিলেন—সে সব কথা বললে।

বাঁটুল একটা ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে জালনা দিয়ে বৌ দেখালে—ঘরের মধ্যে মেয়েদের ভিড়। সোনারবেনের মেয়েরা অত্যন্ত গহনা পরে, এক-একটি মেয়ের আপাদমস্তক গহনায় মোড়া, নাকের নথও বাদ যায় নি। আজকাল যে এত গহনা পরার রেওয়াজ আছে, বিশেষ এই কলকাতা শহরে—সে আমার ধারণা ছিল না।

রাধাকান্তের বোন লক্ষ্মী অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েচে। শিবু যখন আর একবার দোতলার ঘরে বৌ দেখাতে নিয়ে গেল তখন সে একখানা লুচি হাতে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল, কিন্তু ও যেন বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েচে।

রাধাকান্ত ছেলেটি আমায় খুব ভালবাসে এ আমি বরাবরই দেখে আসচি—শিবুর চেয়ে, ভীমের চেয়েও। ওর মধ্যে কপটতা নেই।

কলকাতায় বড় একটা আনন্দ পাওয়া যায় না; কিন্তু কাল সন্ধ্যা ছ-টার সময় বাসায় ফিরে এসে বারান্দাতে বসে আছি, হঠাৎ মনে আপনা-আপনিই আনন্দ এল। সকলের কথা মনে এল। দেখলুম ভেবে নিরাকার ভগবানকে আমি বুঝি নে, তাঁর ধারণাও করতে পারি নে—God as pure spirit. তাঁকে বুঝতে পারবো না যতক্ষণ তাঁর রূপ না পাচ্ছি। যখন তিনি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে আসবেন, তখন তাঁকে আমরা ভক্তি করতে পারি। কেননা মানুষ নিরাকার নয়। এমন সে কখনও জীবের কল্পনা করতে পারবে না যার প্রাণ আছে, মন আছে, অথচ আকার নেই। নিরাকার ভগবানের উপাসনা কি সোজা ব্যাপার?

কিন্তু এসব কথা অবান্তর। আমার মনে উঠল একটা অন্য ভাব। খুকুদের কাছে একটা বারো-তেরো বছরের ছোট মেয়ে খেলে বেড়াচ্চে। মেয়েটি ভারী সুন্দরী, নীলাম্বরী শাড়ি পরনে বিদ্যুতের মত ছুটে ছুটে খেলে বেড়াচ্চে। মাথার খোঁপাটিতে যেমন ঘন কালো চুল, তেমনি পরিপাটী করে বাঁধা। ওকে দেখলেই মনে হল, Out of clay

ভগবান এমন সুন্দর ছাঁচে গড়েচেন, এমন আকারে গড়েচেন—আর তিনি নিজে নিরাকার, এ কেমন করে ভাবতে ভাল লাগে। কি অদ্ভুত রসায়ন যার বলে মাটি থেকে অমন সুন্দরী মেয়েটির মত চেহারা তৈরি হয়েচে! তিনি নিজেও ইচ্ছা করলে সুন্দর মূর্তিতে প্রকাশ হতে পারেন নিজে, যে দেশের লোকে যা ভালবাসে সেই মূর্তিতে। যেমন ধরা যাক, আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরে গলেবনমালা, মাথায় শিখিপুচ্ছ, হাতে বেণু এই শ্রীকৃষ্ণের কিশোর মূর্তির প্রচলন, তাও দ্বারকা বা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে কেউ চায় না—সে সময় তিনি নিশ্চয় প্রৌঢ় হয়েছিলেন যদি সত্যি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে থাকেন—কিন্তু চাইবে সবাই বৃন্দাবনের সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে। সুতরাং আমাদের দেশের লোকের রক্তে ওই শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের রূপ নৃত্য করচে—আমাদের দেশের হাওয়ায় তাঁর বাঁশি বাজে, পাখিরা তাঁর নাম করে—এদেশের মাটিতে তার চরণচিহ্ন সর্বত্র। এদেশে ভগবানের সাকার মূর্তির কথা ভাবতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিই এসে পড়ে মনে। যে ভালবাসে ওই মূর্তিকেই ভালবাসে, যে না ভালবাসে সেও পাকেচক্রে ওই মূর্তির কথাই ভাবে, শেষে ভালবাসা এসে পড়ে মনে কোন অলক্ষ্য দ্বারপথ বেয়ে।

কলকাতা শহরের একটা অদ্ভুত রূপ আছে, যেটাকে দেখতে হলে বিকেল ছ-টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত জনবহুল স্কোয়ার, সাধারণ পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার, ভাল ক্লাব প্রভৃতি ঘুরে বেড়ানো দরকার। কোনও পার্টিতে গিয়ে স্থাণুবৎ অচল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে শহরের এ ঐশ্বর্য, রূপ হারিয়ে ফেলতে হয়। এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকলে হয় না—ট্রামে বা বাসে ঘুরে বেড়াতে হয়, মোটর যদি না থাকে। আলো না জ্বললে শহরের রূপ খোলে না। আজ ভোরে বেরিয়েছিলুম একখানা ট্রামের all day ticket কেটে। কারণ নানা জায়গায় ঘুরতে হচ্চে, রবিবার ভিন্ন সুবিধে হয় না। কমলাদের হোস্টেল হয়ে মণীন্দ্রলালের ওখানে গিয়ে দেখি পুরো আড্ডা বসেচে—পরেশ সেন বিলেতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করচে, ভূপতি, মহিম, নরেনদা, সবাই উপস্থিত। সেখানে ঠিক হল ওবেলা ছ-টার সময় 'বিজলীতে' সবাই মিলে 'She'দেখতে যাওয়া হবে। মণি বর্ধনের নাচ হবে আজই ইনস্টিটিউটে, আমায় মণি বর্ধন একখানা কার্ড দিয়েচে সে-কথা বললুম। ওরা উড়িয়ে দিলে। তখন ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টি মাথায় ট্রামে ও বাসে সাঁতরাগাছি গিয়ে পৌঁছই ননীর বাড়ি। ননীরা বাসা বদলে আর একটা বাড়িতে এসেচে।

'বিজলী'তে এসে দেখি শুধু পরেশ সেন এসেচে। একটু পরে মণীন্দ্র ও ভূপতি এল। আমরা সবাই ফিল্ম দেখলুম। 'বিজলী'তে এমন একটা atmosphere আছে যে যেখানে বসে ফিল্ম দেখে সুবিধে হয় না। ভাল সঙ্গ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন যেখানে সেখানে বসে ছবি বা থিয়েটার বা যে কোনও আমোদ-প্রমোদ ভাল লাগে না। আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ, সুবেশা তরুণীর দল, পরিপাটী আসন—এ সবের খুব বড় একটা স্থান আছে ছবি বা থিয়েটার দেখাতে। ওখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে আলিপুর ও খিদিরপুর হয়ে বাসায় ফিরলুম। পথের বৃষ্টিস্নাত গাছপালার ওপর শ্যাওলা পড়ে বেশ দেখতে হয়েচে, কার্জন পার্কে ফুল ফুটে আছে, নরনারীর চিত্র—বেশ লাগল। কলকাতার এই প্রমোদসজ্জা অতি চমৎকার। এত বড় একটা শহরের এ রূপ ভাল করে দেখবার জিনিস।

পরদিন বিকেলে তরুদের বাড়ি গেলুম শ্যামবাজারে, সেখান থেকে সন্ধ্যায় রঙমহলে বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক দেখতে গেলুম 'কালের মন্দিরা বাজে' ও 'অতি আধুনিক'।নাটক দু'খানা কিছুই নয়, অতি বাজে, তবে গান ও variety show হিসেবে অনেকগুলো গুণী লোককে একত্র করেচে বটে, নাটকের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। হেমেনদা এসে এক কোণে চুপ করে বসে আছেন। দেখা করে এলাম। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খুব জমিয়ে আড্ডা দিতে দিতে থিয়েটার দেখা গেল।

গত শুক্রবারে শ্রীরামপুরে দিদির মেয়ে প্রভার বিয়ে হল। আমি প্রথমে গেলুমলীলাদিদিদের বাড়ি। লীলাদির শরীর প্রথমে খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন কিছু সেরেচে। অমিয় কলেজ থেকে এল রমেশ করিরাজকে সঙ্গে করে। ওখানে অল্পক্ষণ বসেই দিদির বাড়ি গেলুম। ওরা সকলে মিলে স্ত্রী-আচারের সময়ে বরকে ঘিরে আলো নিয়ে প্রদক্ষিণ করলে। আমি ওদের সকলকে অনেকদিন পরে এক জায়গায় দেখলুম,—বড় ভাল লাগছিল। রাত দশটার ট্রেনে কলকাতায় এলুম।

পরদিন শনিবার বনগাঁ যাব, ঠিক দুপুরবেলা থেকে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি শুরু হল—অতি কষ্টে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তো ট্রেন ধরলুম। বৃষ্টিস্নাত ঘন সবুজ গাছপালা, ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ট্রেন বনগাঁ গিয়ে পৌঁছল। খয়রামারিতে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেলুম।

তার পরদিন সকাল থেকে কি বিশ্রী বাদলা! নদীর জলে ঘোলা এসেচে, ঘাস পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে, এত জল বেড়েচে নদীতে। এখন তো খুবই ভাল, মুশকিল বাধবে সেই কার্তিক মাসে যখন হাঁটুভর কাদা হবে নদীর ধারে সর্বত্র।

সোমবার বৈকালে চলে এলুম কলকাতায়। দিনটা পরিষ্কার ছিল, নীল আকাশ, রৌদ্রও উঠেচে। মনে হল ওই প্রজাপতির দলের উড়ে বেড়ানোর দিকে চেয়ে চেয়ে সারাদিন যদি বসে থাকি, চমৎকার গল্পের প্লট্‌ মনে আনতে পারি। এই আলোছায়ার খেলাতেই মনের ভাব নতুন ধরনের হয়—মাটির সঙ্গে প্রস্ফুটিত ভায়োলেট রঙের বনকলমী ফুলের শোভা বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের রূপে।

আজ স্কুলের ছাদ থেকে দুপুরের চনমনে রোদে দূর আকাশের দিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানটি মনে পড়ল—

কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে।

ওগো, ঘরে ফিরে চল কনককলসে জল ভরে'।।

এই গানের ছত্র দু'টির সঙ্গে আমার আঠার বৎসর পূর্বেকার প্রথম যৌবনের জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চেয়ে চেয়ে মনে হল বর্ষাসতেজ সবুজ গাছপালা বনঝোপে ঘেরা কোন একটি নিভৃত পল্লীভবনে তারা এখনও সব কিশোরই রয়ে গিয়েচে কত বৎসর আগের সেই এক প্রথম শরতের দিনগুলির মতো। কোথায় যে তারা ছায়াছবির মত মিলিয়ে গিয়েচে রজনীর মধ্যমে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ যেমন মিলিয়ে যায়, এ কথা ভুলেই গেলুম ক্ষণকালের জন্যে। পেট্রার্কের সম্বন্ধে যে কথা হয়েচে, বড় সত্যি সে কথা। 'Know that for a lofty soul death is but a release from prison, that she frightens only those who look for their whole happiness in this poor earth.' ইত্যাদি।

প্রায় ছ-বছর পরে আবার রামরাজাতলায় গিয়েছিলুম রামরাজা ঠাকুরের ভাসান দেখতে। ননীদের বাড়ি গিয়ে উঠলুম, জতু খুব খুশি হল, জতুর মাকে দেখলুম আজ বহুকাল পরে। অনেক সব পুরোনো কথা হল। সাঁতরাগাছি গ্রাম সম্বন্ধে ননী এমন সব গল্প করলে যাতে জায়গাটার ওপরে আমার কোন শ্রদ্ধা রইল না। একজন লোকের স্ত্রী একটু পাগল মত, সে লোকটা নাকি তার স্ত্রীকে প্রায়ই এমন মারে যে দু-তিন দিন বেচারী আর উঠতে পারে না। অথচ সেই লোকটি এখানে নাকি একজন সমাজপতি! কলকাতার এত কাছে—কালচার বলে কোনও জিনিস নেই এখানে, লোকে বোঝে দশটায় খেয়ে আপিসে ছোটা, আর রবিবার দিন ভাল করে বাজার করে দুপুরে ঠেসে খাওয়া। গ্রামটাও অত্যন্ত নোংরা, চারিদিকে খোলা ড্রেন, জঞ্জাল, দুর্গন্ধ, নোংরা জল গড়িয়ে চলেচে রাস্তার পাশ দিয়ে। আমি যতক্ষণ ছিলাম, দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় আর কি।

রামরাজার মিছিল বার হবার আগে আমি ননী দু-জনে পথের ধারে একখানা গরুর গাড়ির ওপর গিয়ে বসলুম। প্রথমে বাক্‌সাড়া ও ব্যাতড়ের নবনারী কুঞ্জর বেরুল, সঙ্গে অনেক সঙ, কাগজের এরোপ্লেন, রাক্ষসী ইত্যাদি। পেছনে এল রামরাজার মিছিল। শেষের মিছিলটাই বড় কিন্তু এমন কিছু দেখবার কি আছে বুঝলুম না। রাস্তার দু-পাশে, ছাদে, বারান্দায়, পথের ধারে হাজার হাজার মেয়েমানুষের ভিড়। এ মেয়েদেরই দেখবার জিনিস। ওরা আজ এখানে আসে রাজরাজাতলায় সিঁদুর দিতে ও মিছিল দেখতে। সব মেয়েরই কপালে অনেকটা করে সিঁদুর লেপা। ভিড়ের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের কিশোরী কাকার ছেলে সন্তোষ আর জীবনের সঙ্গে দেখা হল। সন্ধ্যার সময় আবার

ননীদের বাড়ি ফিরে এসে চা খেলুম। আজ ২৩শে শ্রাবণ বলেই মনটা মাঝে মাঝে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল, অনেকদিন আগেকার এই সন্ধ্যা গোধূলির একটা ছবি পর-পর আমার মনে আসছিল। জতু দেখলুম মনে করে রেখেচে, সে ননীকে বললে—কোন্ গানটা গাওয়া যেত না বিভূতির সামনে, মনে আছে? ননীরও মনে আছে। সে বললে—জানি : 'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে এই গানটা। আমি হাসলুম। এরা বেশ লোক। আমার জীবনের কতদিন আগেকার কথা এরা কেন মনে রেখেচে, কি দরকার এদের! বিশেষ করে জতু মেয়েটি বড় ভাল, এত স্নেহশীলা! সন্ধ্যার পরে চলে এলুম, বাসে ভয়ানক ভিড়, মল্লিকের ফটক বন্ধ, বাস ঘুরে এল জামতলা দিয়ে। সারাদিন পরে কলকাতার মুক্ত হাওয়ায় এসে এখন বাঁচলুম। জতু বার বার বললে—আজ রাতটা থেকে যান না, পাঁপর ভাজবো এখন। আমার থাকবার জো নেই, লেখা আছে।

বললুম—আর একদিন এসে রাত্রে থাকব।

স্পেনের বিদ্রোহ কি ভীষণ মূর্তি ধারণ করেচে! বাড়াজোজ শহর বিদ্রোহীরা অধিকার করেচে, রাস্তায় রাস্তায় barricade এবং প্রত্যেক barricade-এর গায়ে মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে আছে, আর স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা মৃতদেহের স্তূপ খুঁজে নিজেদের বাপ, ভাই, ছেলে, স্বামীর দেহ বার করতে ব্যস্ত। মানুষ এখনও কত আদিম যুগে পড়ে রয়েচে তা এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়। জার্মানিতে বিদ্রোহের সময়েও ঠিক এই ধরনের নিষ্ঠুর কাণ্ড এই সেদিন ঘটে গিয়েচে, Ernest Toller-এর বই পড়লে তা জানা যায়। মানুষের প্রতি মানুষ এমন senseless নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান কি করে করতে পারে ভেবেই পাই নে।

এর মধ্যে বড় মানুষও জন্মেচে বৈকি! Ernest Toller-এর ভাষায় বলি :—

In the war there lined a man among millions Karl Liebkrecht; his was the voice of truth and of freedom. Even the prison groove could not silence that voice,

এদের ideal যে কি তা বুঝি নে। স্পেনে socialist ও communist-রা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গণতন্ত্র স্থাপন করলে, খুব ভাল কথা। এ পর্যন্ত বুঝি। আবার এল Fascists-এর দল, এরা বিদ্রোহ করচে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে socialist-দের শাসনের বিরুদ্ধে, কিন্তু কী ভীষণ রক্তারক্তি আর নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, ভাবলে বর্তমান সভ্যতার ওপরে মানুষের আস্থা থাকে না। দলে দলে যুদ্ধের বন্দীদের পুড়িয়ে মারচে, বিষাক্ত গ্যাস পর্যন্ত ব্যবহার করচে।

দার্শনিক সত্যিই বলেচে—An easily realizible ideal quickly loses its power of stimulating, nothing lets a man down with such a pump into listless disillutionment as the discovery that he has achieved all his ambitionand realized all his ideals. Once actually seized the peach turns out to be a Dead Sea fruit.

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে কলকাতায় এবার গ্রীষ্মের ছুটির পর এসে বিশেষ করে নানারকম অভিজ্ঞতা হচ্চে। এই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে। জীবনটাকে এভাবে দেখাও বড় দরকার বলে মনে করি। তবে পার্টিতে জীবন দেখার চেয়ে আমি যে লোকজনের বাসায় গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে মিশি, ওতে আরও ভাল করে ওদের দেখা হয়, যেমন রামপ্রসাদের বাড়ি, বন্ধুদের বাড়িতে বিনুর পাগল হয়ে যাওয়া রাতের দৃশ্য, রমা যখন আমাদের কাছ হতে চলে গেল মীরাট, তার সেই আকুল কান্নার দৃশ্য, রাজপুরে তেঁতুলের বৌয়ের অসুখের জন্যে চান্দ্রায়ণ করবার ব্যাপার ইত্যাদি।

অনেকদিন আগে কামাখ্যা ছিল ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের একজন চাঁই, থিয়েটারের সময়ে মেয়েদের পার্ট সে-ই করতো, এবং আমাদের সময়ে বেশ নামও করেছিল তাতে। কাল ইনস্টিটিউটে আর একটি ছেলেকে

'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে' নীহারিকার পার্ট করতে দেখলুম— এত চমৎকার মানিয়েছিল তাকে যে কোথায় লাগে মেয়েদের! যেমন রূপসী, তেমনি কমনীয় কান্তি, তেমনি গলার সুর ও গান। হায় কামাখ্যা, তুমি এখন কোথায় তাই ভাবি! সে ভাল লেখাপড়া শেখে নি, থিয়েটার করে বেড়াতো, বোধহয় বি. এ. পাসটাও করেছিল। কোন পাড়াগাঁয়ে এতদিন ছেলেমেয়ে পরিবৃত হয়ে দাবাপাশা ও দলাদলির চর্চা করচে। এখন তার মনের সে স্ফূর্তি নেই, চোখের জলুস কমেচে, চুলে পাক ধরেচে, মুখশ্রীর সে কমনীয়তা আর নেই। এখন যে নীহারিকার পার্ট করল, সে ছেলেটি সে সময়ে হয়তো ছিল তিন-চার বছরের শিশু।

'মানময়ী গার্লস স্কুল' দেখতে দেখতে হঠাৎ আজ কামাখ্যার কথা মনে পড়ল কেন কি জানি!

একদিন মাত্র কলকাতা থেকে বেরিয়েছি অমনি কি ভালই লাগচে। আজ সকালে উঠে অশোক গুপ্তের বাড়ি গেলুম, সেখান থেকে খেয়ে দু-জনেই যতীশবাবুদের গাড়িতে গ্রে স্ট্রীট দিয়ে স্ট্যান্ড রোড দিয়ে হাওড়া স্টেশনে। বসুমতীর সেই পুরোনো বাড়িটা, বাবার সঙ্গে যেখানে বাল্যে একদিন এসেছিলুম, সেটা সেই রকমই আছে। কুসুম বলে বাল্যে যে মেয়েটিকে জানতুম, এখন সে বুড়ী হয়েচে, ছেলেবেলায় আমায় তার ছেলের মত ভালবাসতো, সে থাকে কাছেই ওই বাড়িটাতে। ট্রেনে ভিড় নেই, কারণ পুজোর সময় তো আর নয়। দিব্যি আরামে বেঞ্চিতে বিছানা পেতে নিলুম। সাঁতরাগাছি স্টেশনে উঠলো কিশোর কাকার ছেলে সন্তোষ, তাকে উঠিয়ে দিতে এল জীবন। আজ দিনটা বাদলা, জোলো হাওয়া দিচ্চে। কোলাঘাটে রূপনারায়ণের কি রূপ, কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি তীরবেগে ছুটেচে। সেই অন্তরীপ মত জায়গাটা, যেটা প্রতিবারই মনে করিয়ে দেয় পুজোর সময়, সেটা কেমন চমৎকার দেখাচ্চে। রেলের বাঁধের ধারে ঘন বনঝোপে কত কি ফুল ফুটেচে। এসব গাছের নাম জানি নে। এ অঞ্চলের গাছগুলি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, একমাত্র বনকলমী ফুল ছাড়া। হলদে কাপাস তুলোর গাছের বড় ফুল, ঘেঁট্‌কোল ফুলের মত বড় বড় ফুল, সাদা সাদা কুচো ফুল, আরও কত কি। এবার জল বেজায় বেড়েচে, সব গ্রামের বাড়িঘরের চারিধারে জল ভর্তি, ডোবা, বিল, পুকুর। কোলাঘাটে গাড়ি একঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল লাইন বন্ধ ছিল বলে। খড়্গপুর ছাড়িয়েচি, সেই সময় আবার মেঘ করে এল। ঝাড়গ্রামে থামবার কিছু আগে সন্তোষ গ্রামের কথা উপলক্ষেবললে—গণেশ মুচির ছোট ছেলেটি মারা গিয়েচে। শুনে খুবই দুঃখিত হলুম, গণেশ বুড়ো হয়েচে, ওই ছেলেটিকে বড় ভালবাসতো। আর একটা খবর বললে—হরিদাদার মেয়ে কনকের বিয়ে হয়েছে এক বুড়ো বরের সঙ্গে। আরও দুঃখিত হলুম, কনক মেয়েটি বড় সুন্দরী। তার জন্যে তার বাবা ওর চেয়ে ভাল বর জোটাতে পারলে না কেন জানি নে, কারণ তার বাবা গরিব নয়, ইচ্ছে করলে দু-পয়সা খরচ তো করতে পারতো।

এইবার ঘন মেঘ করে বৃষ্টি এল। গাড়ি এখন শালবন ছাড়িয়ে গিড্‌নী স্টেশনে এসে পৌঁছেচে। বড় ইচ্ছে ছিল বাকুড়ি যাবো, কিন্তু যাওয়া হল না।

সুবর্ণরেখার ধারে এসে ঘন ছায়াভরা বৈকালে শালবনের মধ্যে এক জায়গায় বসলুম। ওই দূরে সিদ্ধেশ্বরী ডুংরী, যার মাথায় উঠে বসে চিঁড়ে দই খেয়েছিলুম, যার মাথায় উঠে শিলাখণ্ডে নাম লিখে রেখেছিলুম।

চারিধারে শ্যামল বনানী, প্রান্তর, ধানবন, শালগাছ। ওই ওপারে প্রকাণ্ড দীর্ঘ পাহাড়শ্রেণী। সামনে খরস্রোতা সুবর্ণরেখা, তীরে ছোট বড় শিলাখণ্ড, শালচারার জঙ্গল। সন্ধ্যা নেমে আসচে, পাহাড়শ্রেণী নীরব, বনানী নীরব, মেঘলা, সুবর্ণরেখার কুলুকুলু শব্দ ছাড়া অন্য কোনই শব্দ নেই। গত শনিবারে এমন সময় ইছামতীর ধারে বসে আছি।

এই নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়িয়ে পেছনের শালবনের মাথার ওধার দিয়ে পুবদিকে চেয়ে দেখলুম, দুরে এমনি ইছামতী নদী বয়ে যাচ্চে, বাংলা দেশের এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ের কোল দিয়ে। সেই নদীর ধারে একটা গাঁয়ের ঘাটে এক জায়গায় একটা বনসিমের ঘন ঝোপ নত হয়ে আছে ঘাটের পথের ওপরে। একটি মেয়ের ছবি সেই বনসিমের লতার ঝোপের তলায় চিরকাল অক্ষয় হয়ে আছে। ছবিটি মনে পড়তেই অপূর্ব আনন্দে ও মাধুর্যে এই সন্ধ্যা ভরে উঠলো, বাতাস আরও মধুর হল।

আমার ঘরে গত জ্যৈষ্ঠমাসে একদল রামছাগল উঠে উপদ্রব করছিল, আমি হাট থেকে এসে দূর দূর করে ছাগলের দল তাড়িয়ে দিলুম, সেই কথা মনে পড়লো। এই রামছাগলের দল তাড়ানোর সঙ্গে আমার সেদিনের একটা বড় মধুর ঘটনা মেশানো আছে, কেউ তা জানে না—তা আমি এখানে লিখবও না। এটুকু লিখে রাখলুম এজন্যে যে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়িয়ে এই বর্ষাসন্ধ্যায় সেই ঘটনাটা আমার মনে এসেছিল।

সুপ্রভা কত দূরে আছে, তার কথাও মনে হল এ সন্ধ্যায়। বড় ভাল মেয়ে সে, তার মতো মেয়ে কখনো দেখি নি।

এই ডায়েরীটা শেষ হয়ে গেল। আমার জীবনে এই দেড় বছর বড়ই আনন্দের। পরিপূর্ণ আনন্দের। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত—কত নতুন বন্ধুলাভ, কত অভিজ্ঞতা কত পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হল বহুদিন পরে এই দেড় বছরের মধ্যে, এই ১৯৩৬ সালে। যেমন মণিকুন্তলা তার মধ্যে একজন। ভগবানকে এজন্যে ধন্যবাদ জানাই।

কত কি পেলুম এই দেড় বছরে। সব কথা ডায়েরীতে লেখা যায় না। যা এখানে লিখলুমনা তা রইল আমার মনের গভীর গোপন তলে। কর্মহীন অবকাশ-মুহূর্তে তাদের চিন্তা আমায় আনন্দ দেবে। কত জায়গায় বসেই কত ডায়েরী লিখলুম—ভাগলপুরে, ইসমাইলপুরে, দ্বিয়ারায়, আজমাবাদ কাছারিতে, কাশীতে, রাখামান্‌ইসে, নাগপুরে, কলকাতায়।